যখন যেখানে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বতিক
কলিকাতা ২৬

প্রথম প্রকাশ : পঁচিশে বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক :

অমল কান্তি সেনগুপ্ত
বর্তিক-এর পক্ষে
১/৩২ এফ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলিকাতা ২৬

মুদ্রাকর :

নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, প্রাঃ লিঃ
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা ১৩

প্রচ্ছদপট ও অংগসজ্জা :

চিত্তপ্রসাদ

প্রচ্ছদ লিপি :

খালেদ চৌধুরী

প্রাপ্তিস্থান :

গ্রন্থভারত
৪১-বি-রাসবিহারী অ্যাভেনিউ
কলিকাতা ২৬

মূল্য : দুই টাকা পচাত্তর নয়া পয়সা

ভূমিকা

রং-বেরঙের টুকরো কাপড়। জোড়া দিলে হয় বাউলের আলখাল্লা। নিজেদের মধ্যে তাদের যত বৈসাদৃশ্যই থাকুক, বাউলের জীবনই তাদের এক জায়গায় মিলিয়ে দেয়।

এ বইতেও যদি পায়ের ধূলোয় সেই অমিলের মিল পাওয়া যায়, তাহলেই লেখক খুশী।

নানা দুয়োরে প্রত্যাখ্যাত হয়ে লেখাগুলো ফেলেই রেখেছিলাম। 'বর্তিক'-এর উৎসাহ না পেলে হয়ত এ বই কখনই বার হত না। আলখাল্লার ছিটগ্রস্ততা দেখে যাঁরা ভয় পাননি, কাটা-গল্পের বাজারে তাঁদের কপালে কী আছে কে জানে?

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

৮, ৫, ৬০
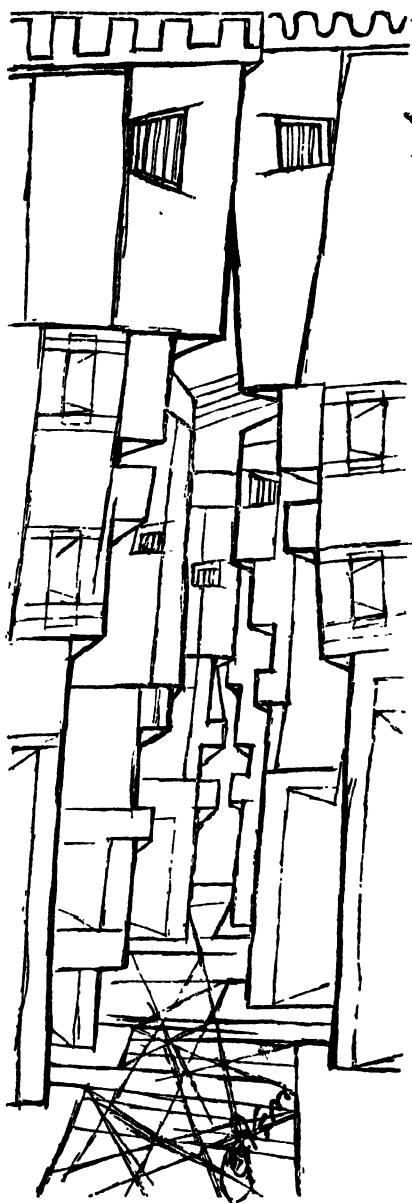
এইটুকু

নেবুতলার গলিতে কেউ বড় একটা সকাল হতে দেখে না।

হোস্‌-পাইপের গলা ফাটিয়ে মাটি-গোলা জলে যখন রাস্তা ভাসাভাসি হয়, শিস্‌ দিতে দিতে চৌবাচ্চার কলে যখন হঠাৎ হুস্‌ করে জল আসে; বাইরের দরজায় ঠিকে ঝি বাড়িতে ডাকাত পড়ার মতো করে জোরে জোরে যখন কড়া নাড়ে, আর পাশের বাড়ির আল্‌সের ওপর থেকে নিচে এঁটো-কাঁটার দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে

একটা ছট্‌ফটে কাক যখন ডেকে ডেকে পাড়া মাথায় করে—আওয়াজ শুনে একরকম চোখ বুঁজেই বলে দেওয়া যায় পৃথিবীর এ-প্রান্তে সকাল হল।

তারপরই নেবুতলার এই গলিটা ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে ওঠে। পায়ের নিচে, মাথার ওপর, সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে—সম্ভাব্য সমস্ত কটা দিক থেকে গল্‌গলিয়ে ধোঁয়া এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে শুয়ে-থাকা মানুষগুলোর দম যখন আটকে ধরে, তখন আর না উঠে উপায় থাকে না। শুধু ওঠবার আগে কড়িকাঠে টাঙানো অন্ধকারের দিকে তারা পা দুটো লাথির মত জোড়া করে সবেগে ছুঁড়ে দেয়।

পাশের বাড়ির ছাদ থেকে একটুখানি আহ্লাদে সোনালি রোদ ঝুঁকে পড়ে দেখে—ছ্যাৎলাপড়া সবুজ উঠোনটুকুতে তার বিষণ্ণ ছায়ামূর্তিটা বার বার পড়ে পড়ে আছাড় খাচ্ছে। কলতলায় ঝির হাত ফস্‌কে থালাটা গেলাসটা পড়ে গিয়ে শান-বাঁধানো মেঝেতে ঝন্‌ ঝন্‌ আওয়াজ ওঠে। আর তাড়াতাড়ি নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে এ-বাড়ির নতুন বউকে সান্ত্বনা দেয়—এ বাড়িতে আজ মানুষ আসবে গো। তারপর বাঁ-হাতের চেটোয় রাখা খড়িমাটির গুঁড়োয়, হাঁটু-বার-করা লাল টেঁটি গামছায়, চটা-ওঠা এনামেলের চায়ের কাপে, গরম ফুলুরি গালে ফেলে উঃ-আঃ করতে করতে কখন যে একটা ফুটফুটে ডাগর দিনের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায় ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারা যায় না।

রোজ রাত থাকতে উঠে জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে গঙ্গা নাইতে যেত ফটকঅলা বাড়ির বুড়ো কর্তা আর গেল লড়াইতে লাল-হওয়া রাখহরি চাটুয্যে। উপুড় হয়ে পরের হাতে তেল মাখতে মাখতে এ-পাড়ায় তারাই শুধু বাবুঘাটে নিজের চোখে সূর্য উঠতে দেখত।

একটু বেলা হলে তাদের গাড়িগুলো পায়ে-টেপা ঘণ্টায়

ঘুঙরের বোল তুলতে তুলতে নেবুতলার গলিতেই ফিরে আসত। বড় বড় বাড়ির বগলের নিচে দিয়ে গলে-আসা এক পাল কচি রোদ গাড়ির তলায় চাপা পড়তে পড়তে একটুর জন্যে বেঁচে যেত। তারপরই ডানপিটে রোদগুলো করত কি, টগবগিয়ে চলা ঘোড়ার ঝুঁটিটা ধরে চলন্ত গাড়ির চালের ওপর টক্ করে উঠে পড়ে পেছনের পা-দানিতে পা রেখে রাস্তার ওপর লাফিয়ে নামতে যেত। কিন্তু কিছুতেই টাল সামলাতে পারত না। পেছন দিকে মাথা করে শান-বাঁধানো রাস্তার ওপর সপাটে উল্টে পড়ত। বার বার আছাড় খেয়েও তাদের এতটুকু হুঁশ হত না।

তারপর রাস্তায় শুয়ে শুয়েই পথ-চলতি লোকদের পাগুলো বলের মতো লোফালুফি করতে করতে এক সময় তারা দিব্যি লায়েক হয়ে উঠত। তারপর মাথায় আরও ঢ্যাঙা হয়ে ইটের রাজ্য ডিঙিয়ে কোথায় যে হারিয়ে যেত কেউ খবরও রাখত না।

এ-গলিতে টেলিগ্রাফের তারগুলো বেশি উঁচু দিয়ে যায়নি। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায়। এ-দেয়ালে ও-দেয়ালে মাথা ঠুকে গলির বাঁকের মুখে হঠাৎ শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন কাতরভাবে ছুটে গেছে যে, ওদিকে চোখ পড়লেই ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে একবার শেষটা দেখে আসি।

তারের গায়ে পা বাধিয়ে হেঁটমুণ্ডি হয়ে ঝুলছে অসংখ্য সুতো। কোনটার সঙ্গে গাঁটছড়া-বাঁধা ঘুড়ি। ঘুড়িগুলোকে নতুন নতুন বেশ দেখায়। যেটার মাথার দিকে গোল পট্টি দেওয়া, সেটা চাঁদিয়াল। চৌখুপি চৌখুপি রকমারি রং যার, সেটা সতরঞ্চি। যতক্ষণ কল বাঁধা থাকে, একটু হাওয়া হলেই উড়তে চায়। তারপর একদিকের কল কেটে গেলে ঠায় ঘোরে। একটা সময় আসে, যখন ঘুড়িটার আদ্যোপান্ত কিছুই আর আস্তো থাকে না। কানের কাছে কাঁপের কাঠিটা ছিঁড়ে গিয়ে একটুকরো রং-চটা ফ্যাকাশে

কাগজ নিশানের মত নাচতে থাকে। আর সেই নিশানটা পাগলের মত ঘুরে ঘুরে একমাত্র আকাশ ছাড়া আর সব দিকেই ইশারা করে দেখিয়ে দেয়। ল্যাজের সঙ্গে বাঁধা চেৎটানের কাঠিটা কী করবে দিশে না পেয়ে কেবল ডাইনে বাঁয়ে একঘেয়ে বিষণ্ণ সুরে নিথর নিস্পন্দ তারের গায়ে গুন গুন করতে থাকে। তখন টেলিগ্রাফের তারটার দিকে তাকাতেও কষ্ট হয়।

কিন্তু শীতের সকালে কিংবা এক পশলা বৃষ্টির পর আকাশে যখন রোদ হেসে ওঠে, তখন গলির বাঁকে ত্রিশঙ্কু তারগুলোর গায়ে ছোট্ট মেয়ের নাকের নোলকের মত ফোঁটা ফোঁটা জল আর বিন্দু বিন্দু শিশির বিপজ্জনকভাবে ঝুলতে থাকে। এক হাত ঘোমটা টানা থাকলেও খড়খড়ি তুললে সে দৃশ্য চোখ এড়ায় না।

সারাদিন বৃষ্টির পর বিকেলবেলায় নেবুতলার গলিতে এক আজব ব্যাপার ঘটতে দেখা যায়। রাস্তার যে যে জায়গায় খোয়া উঠে গিয়ে খোঁদলের মধ্যে জল জমেছে, তার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে কেউ কেউ হঠাৎ অবাক হয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর রাস্তার ময়লা জলের দিকে মাথা হেঁট করে দাঁড়ায়। নিস্তরঙ্গ জলে একটি স্থির চিত্রার্পিতবৎ ছায়া মানুষের পায়ে আড় হয়ে পড়ে শহরে এসে ভুলে যাওয়া আকাশটার কথা বার বার মনে করিয়ে দেয়।

পাড়ার বেশির ভাগ বাড়িই পুঁয়ে-পাওয়া ক্ষয়াটে। চোয়ালের হাড় বার করা গাড়ি-বারান্দাগুলোর জন্যেই বোধ হয় বাড়িগুলোকে কেমন যেন একটু কোল-কুঁজো কোল-কুঁজো বলে মনে হয়। এক-তলার রোয়াকে উঠে দড়িতে ঝোলানো বাঁশের আল্‌নার মত বারান্দাগুলোকে লাফ দিয়ে ছোঁয়া যায়। এই গুণটুকুর জন্যেই চড়কের দিন রাত্তিরে জেলেপাড়ার সঙ দেখতে এ গলিতে লোক ভেঙে পড়ত।

গলিটা আজও ঠিক তেমনিই আছে।

শুধু নেই মুসলমান শালকরের সেই দোকানটা, যেখানে হেলানো বাঁশের গায়ে টান-করে-বাঁধা দড়িতে টাঙানো রংবেরঙের ভিজে শালআলোয়ানগুলো এ গলির মানুষদের সাতসকালে শীতের কথা ভাবিয়ে তুলত। তারপর বেলা বাড়লে রংবেরঙের ভাঁজ-করা জাপানী পাখার মতো গলির একটা জায়গাতে নড়ে নড়ে তারা হাওয়া করত।

যদি খুঁটে খুঁটে দেখ, দেখবে বিলক্ষণ বদ্‌লেছে।

ময়রার দোকানে গরম জিলিপি ভাজার ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দে ভোর এখনও অবশ্য হয়, তবে তার গন্ধ কাঁচ-ঢাকা দেয়াল ফুঁড়ে কতদূর অব্‌দি যায় সন্দেহ আছে।

কবিরাজ মশাই নেই। চুল-পাকা বুড়োদের ভিড়ে গিজ গিজ করত তাঁর যে বৈঠকখানাটা, যার পাশ দিয়ে গেলে দিনরাত কানে আসত গুড়ুক গুড়ুক শব্দ আর হাওয়ায় ভুর ভুর করত ভাল অম্বুরি তামাকের গন্ধ, এখন সেটা মড়ার মতো পড়ে আছে। কবিরাজ মশাইয়ের ডাক্তার ছেলে ডিগ্রি আনতে বিলেতে গিয়েছিল; সে নিশ্চয় আজও গলির মায়ায় বাঁধা পড়ে নেই।

মিষ্টির দোকানের এদিকে খোলার বস্তিটা আজও আছে। হবার মধ্যে আরও ছাতা-পড়া, আরও পুরনো হয়েছে। সেই ভুঁড়িপেট হালুইকর, রোগা রোগা ডকের খালাসী, সেই পাইপ-সারানো মিস্ত্রী, সেই ঘণ্টা-নাড়ানো টিকিওয়ালা পুরুত, পানের দোকানদার বুড়ো, উড়িষ্যা থেকে আসা সেই মানুষগুলো—সব এখনও কি ওখানেই থাকে?

চুন-সিমেণ্টের দোকানের পাশে উঁচু তিনতলা বাড়িটাতে কাবলীওয়ালারা অনেক দিন নেই। এ গলিতে একদিন তাদের খাতির ছিল। লোকগুলো এত লম্বা যে, এ পাড়ার কাউকে কথা

বলতে দেখলে মনে হত যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে। ওদের হাতের চেটোগুলো বেতের লাঠির মাথায় এমন ভাবে উপুড় করা থাকত যে, দেখে মনে হত সিংহ যেন থাবা দিয়ে শিকার ধরেছে। পেছন ফিরলে ওদের হাত-কাটা লাল কিংখাবের জামা আর মাথায় কালো বাব্‌রি চুলের মাঝখানে চওড়া গর্দানটা অদ্ভুত শাদা দেখাত। আপিসে কাজ করা পাড়ার কেরানিবাবুরা বিশুদ্ধ বাংলায় ওদের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে 'আগা-সাহেব' 'বাগা-সাহেব' বলে এমন একটা সমানে-সমান ভাব নিয়ে কথা বলতেন যে, পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের রীতিমত তাক লেগে যেত। হাঁ, বীরপুরুষ বটে! সাহেবসুবোদের সঙ্গে কি রকম তুড়ি মেরে কথা বলছে দেখ!

নিবারণবাবু অনেক দিন গত হয়েছেন। থাকলে দেখতেন তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফড়িঙের মাও আর নেই।

সেই নিবারণবাবু। কোন কারণ না থাকলে কারণ তৈরি করে নিজেকে যিনি দুঃখ দিতেন। দুঃখের বিষয়, ফড়িঙের মা যাঁর স্ত্রী।

আট-হাতি কাপড় পরে পিঠে কয়লার বস্তা নিয়ে চোখে চশমা-আঁটা নিবারণবাবু কুঁজো হয়ে বাড়ির গলিতে ঢুকছেন, কোনদিকে না তাকিয়েও তিনি রাস্তায় শুধু জুতোর শব্দ শুনে বুঝতে পারছেন লোকজন সারা রাস্তা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। নিবারণবাবু বুঝতেন সব।

একমাত্র ফড়িঙের মাকে ছাড়া।

নিবারণবাবু চাইতেন ফড়িঙের মা কষ্ট পাক। কেননা আগুনে না পুড়লে মানুষ খাঁটি হয় না। দুঃখই জীবনের সার সত্য। ইত্যাদি।

ফড়িঙের মাকে নিবারণবাবু প্রায় এক যুগ স্পর্শ করতে ভুলে গেলেন, নিজের বড় ঘর ছেড়ে কোণের ঘুপচি ঘরটায় উঠে গেলেন,

বাড়িতে স্ত্রীর হাতে না খেয়ে গা-ঘিনঘিনে হোটেলে দু-বেলা খাবার বন্দোবস্ত করলেন, শেষ পর্যন্ত নিজে পিঠে করে কয়লা বয়ে আনার সিদ্ধান্ত করলেন।

কিন্তু ফড়িঙের মাকে কিছুতেই কষ্ট দেওয়া গেল না।

এই করতে করতে নিবারণবাবু চুল পাকিয়ে ফেললেন এবং শেষ অব্দি বুড়ো হয়ে গেলেন।

বুড়ো হয়ে নিবারণবাবু আরও একা পড়ে গেলেন, তাঁর দুঃখ আরও বাড়ল—কেননা ফড়িঙের মাকে সে আন্দাজে কই দেহে-মনে তেমন বুড়ো হতে দেখা গেল না।

শুধু তাই নয়। ফড়িঙের মার বিয়ের আগে নিজের একটা সুন্দর নাম ছিল। কুসুম। চেহারা ভালো বলে আদর করে তাঁর বাবাই সে নামে ডাকতেন।

ফড়িঙের মা করলেন কি, বাপের বাড়ির লোকজনদের এ বাড়িতে ঘন ঘন আসতে দিয়ে রীতিমত কায়দা করে তাঁর সেই ভুলে-যাওয়া পুরনো নামটাকে আবার ডেকে ডুকে এ বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন।

আর ফড়িং? বাপের কুপুত্র নয় বটে, কিন্তু মার কাছে লাই পেয়ে পেয়ে যে-হারে সে নাটক-নভেল পড়তে শুরু করে দিল, তাতে বোঝাই গেল ফড়িং এবার উড়বে। ফড়িঙের মার বড়লোক বাপের বাড়িই যত নষ্টের গোড়া। কুসুম বোনদের মধ্যে ছোট। বাবা তো খোলাখুলিই বলতেন, আট মেয়েকে পার করতে গিয়ে ছোট মেয়েটা জলে পড়ে গেল। ভাইরা আগে ছোট বোনকে লুকিয়ে চুরিয়ে সাহায্য করত, এখন খোলাখুলি মনি অর্ডারেই টাকা পাঠায়।

ফড়িঙের মার শখ মেটাবার মত টাকা নিবারণবাবুর যে নেই তা নয়। নিবারণবাবু টাকার ব্যাপারে খুব যে কঞ্জুষ তাও নয়। দু-মেয়ের বিয়েতে তাঁর চেয়ে বেশি টাকা পাড়ার আর কোন

মেয়ের বাবা খরচ করেনি। এটা তাঁর নিজের কথা নয়। মেয়ে-মহলেরই মত।

নিবারণবাবুর মতে ফড়িঙের মার কাল হল লেখাপড়া শিখে। লেখাপড়া শিখলেই আর ঠেকাবার উপায় নেই, নাটক-নভেল পড়বেই। আর ওর মধ্যে যে কী সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা লেখা থাকে, ছেলেবয়সে একবার চোখ বুলিয়েই তিনি তা টের পেয়েছিলেন। যেমন ধরা যাক, ফড়িঙের মা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব। সেটা নাকি ভালবাসা নাও হতে পারে, শুধু একটা টানও হতে পারে। টান, ভালবাসা, হেন-তেন করে লেখকেরা কেন মানুষের মাথাগুলো ঘুরিয়ে দেয় তা কি আর তিনি জানেন না? ফড়িঙের মা তাঁর অগ্নি-সাক্ষী-করা স্ত্রী—তাঁকে তিনি আলবৎ ভালবাসেন।

ভালবাসেন বলেই তো ফড়িঙের মাকে তিনি আঘাত দেন। ফড়িঙের মা শুধু যদি একটু চেঁচিয়ে কাঁদত!

কেন কাঁদে না সে-বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে ভাবতে নিবারণবাবু একদিন মাথার শির ছিঁড়ে মারা গেলেন।

ফড়িঙের মা মারা গেলেন অনেক পরে। ঘরে ছেলের বউ এনে এবং নাতির মুখে ভাত দিয়ে।

নিবারণবাবুকে যমরাজা যদি নিজে বাছাই করে নেবার ভার দিয়ে থাকে, তাহলে নিবারণবাবু নিঃসন্দেহে নরকই বেছে নিয়েছেন। কেননা সেখানে দুঃখের আগুনে পুড়ে খাঁটি হওয়ার অফুরন্ত সুযোগ।

কিন্তু সেখানেও তিনি বড্ড একা পড়ে গেলেন। কেননা ফড়িঙের মাকে বলতেই তিনি নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে স্বর্গে চলে গেছেন।

.   .   .

গলির মধ্যে ঢুকে সেই সব পুরনো কথা মনে করতে করতে এককালে এ-পাড়ায় থাকা চল্লিশ বছরের এক বুড়ো মিন্‌সে হঠাৎ এইটুকু হয়ে গেল।

আসমান জমি

দিন গড়িয়ে মাস। মাস গড়িয়ে বছর। রাইফেলের গুলিতে বেঁধা, কাঁদুনে গ্যাসে দম-আটকানো, না-খেয়ে-শুকোনো দেড়-খানা বছর। চোখ টাটিয়ে গেছে অষ্টপ্রহর ঠেসে-ধরা কংক্রিটের দেয়ালে আর লোহার জালে।

পরোয়ানা এল। যেতে হবে বক্সায়।

অসংখ্য স্মৃতি জড়ানো দমদমের জেলখানা। যাদের সঙ্গে দিনের পর দিন রাতের পর রাত একসঙ্গে থেকেছি, হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছি

মৃত্যুর সামনাসামনি, পার হয়ে এসেছি ছোটবড় অনেক অগ্নিপরীক্ষা —তাদের ছেড়ে যেতে হবে।

তখনও লক-আপ খোলার সময় হয়নি। জেল বদ্‌লির হুকুম হয়েছে যাদের, শুধু তাদের ঘরের তালাগুলো খুলে গিয়েছে। বন্ধ সেলগুলোর সামনে এসে দাঁড়ালাম। গরাদের ভেতর থেকে মুঠো-করা হাত অন্ধকারে আমাদের বিদায় দিল। পাছে গলার স্বর একটুও কেঁপে যায়, তাই কারো মুখে কথা নেই।

নিচে একতলার একটা কোণে বন্ধ গুমোট ঘরে রাতভোর আবোল তাবোল বকে চলেছে গঙ্গা সিং। চেঁচাতে চেঁচাতে গলা ভেঙে গেছে, মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে। তবু বিরাম নেই। পাঞ্জাবের কমরেড গঙ্গা সিং। রেলের মজুরদের অত্যন্ত প্রিয় নেতা। কলকাতায় এসেছিল শান্তি সম্মেলনে পাঞ্জাবের প্রতিনিধি হয়ে। হাওড়া স্টেশনে নেমেই গ্রেপ্তার হয়। জেলে এসে সাতচল্লিশ দিনের অনশন ধর্মঘটের পর থেকেই তার মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা যায়। বদ্ধ উন্মাদ এখন। গভর্ণমেণ্ট তবু তাকে ছাড়েনি।

ভারি চমৎকার গান গাইতে পারে গঙ্গা সিং। অধিকাংশই তার নিজের লেখা। তার গানে দু-টুকরো হওয়া পাঞ্জাবের মর্ম বেদনা, রাবি-ঝিলমের স্বপ্নগাথা, কোটি কোটি মানুষের বুকের আগুন-জ্বালানো আশা। আজও ভোলেনি সে বিস্‌মিলের সেই ফাঁসির আগের গান। সমস্ত বোধশক্তি লুপ্ত হয়ে গেলেও আজও যখন কেউ তার ছেলে-বৌয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়, হঠাৎ ভিজে যায় তার চোখের পাতা।

গঙ্গা সিং-এর সেলের সামনে আসতেই ও কী বুঝল জানি না, হঠাৎ দু-হাতে গরাদ নাড়া দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—বক্‌সা বদ্‌লি চলবে না। আমাদের চোখের দিকে কিছুতেই তাকাল না। আপনা থেকে মাথাটা হেঁট হয়ে গেল। সে ভুলতে পারেনি আমাদের

দৃঢ়পণ সংগ্রামের কথা। বক্সায় নির্বাসিত হওয়ার বিরুদ্ধে আমরা দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়েছিলাম। মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে উঠেছে রক্ত, তবু হাসপাতালের হাজার প্রলোভনের মধ্যেও বাচ্চা ছেলেরা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে গেছে অনশন। কত লোক চিরজীবনের মত পঙ্গু হয়ে গেছে। সেলাম সেই বীর সৈনিকদের।

ব্লক থেকে বেরিয়েই ডেটিনিউ ইয়ার্ডের বাঁধানো সড়ক। প্রভাত-সুমথ-মুকুলের রক্তাক্ত স্মৃতিজড়ানো রাস্তা। ৯ই জুনের বিকেলের কথা মনে পড়ে। ইন্টারভিউ শেষ করে প্রভাতের দিদি জেল গেটের বাইরে যাচ্ছেন, প্রভাত দাঁড়িয়ে। দিদির সঙ্গে সেই তার শেষ দেখা। সুকান্তর কবিতা চমৎকার আবৃত্তি করত সুমথ। উত্তেজনায় আবেগে তার গলা কেঁপে যেত। মুকুলের কচি কচি মুখটা আজও চোখের ওপর ভাসছে।

গুলিগোলা চলবে আমরা জানতাম। গোবর্ধনকে আগের দিন প্রেসিডেন্সিতে গুলি করে মেরেছে। ৯ই জুনের রাত্তিরে থমথমে রাস্তায় পায়চারি করতে করতে কেন জানি না হঠাৎ মুকুলকে দেখে মনটা খচ্ করে উঠল। আজও সে কথা মনে হলে চমকে উঠি।

জলের পাম্পের কাছে গুলিতে গুলিতে দু পাশের দেয়াল ঝাঁঝরা হয়ে আছে। সারাদিন অনশনক্লিষ্ট নিরস্ত্র বন্দীদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সেদিন পাইকারী হত্যার ষড়যন্ত্রকে রুখে দিয়েছিল। ডেটিনিউ ইয়ার্ডে ঢুকতে প্রথমেই ৪নং ব্লক। গুর্খা ফৌজ সারারাত গুলি চালিয়েও সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত নিজেদের ছোঁড়া টিয়ার গ্যাসে নিজেরাই কাবু হয়ে ভোরের দিকে ফিরে গিয়েছে।

জলের পাম্পের কাছে আসতেই মনে পড়ে গেল সেই ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ দিনের কথা।

বৌবাজারের মোড়ে আমাদের মা-বোনেরা আমাদেরই বাঁচাবার জন্যে প্রাণ বলি দিয়েছে, সে কথা ভুলব কেমন করে? আমাদের রক্তে জমা থাকল সেই ঋণ।

রাস্তার ওপাশে হাজতী ওয়ার্ড। জানলায় জানলায় মুঠো-করা হাত আর মুখ দেখা গেল। বেশির ভাগ হাওড়ার গাঁয়ের চাষী। নব্বই বছরের বুড়ো থেকে আট বছরের বাচ্চা ছেলে পর্যন্ত আছে। কৃষক আন্দোলন করে জেলে এসেছে। নব্বই বছরের বুড়োর নামে ডাকাতির, আট বছরের ছেলের নামে নারীধর্ষণের অভিযোগ। ছ-মাস আট-মাস ধরে কেবলই মামলার তারিখ পড়ে। প্রায়ই মামলা টেঁকে না। কিন্তু সাজার চেয়েও বেশী হয়ে যায়। কাটার অভাবে নষ্ট হয়ে যায় মাঠের ধান। না খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মরে যায় বৌ-ছেলেপিলে। আমরা বক্সায় যাচ্ছি শুনে তাদেরও বুক ফেটে যায়। আলাদা থাকলেও এতদিন আমরা তো তাদের আত্মীয়বন্ধুর মতই ছিলাম।

আপিসের ঝামেলা মেটাতে বেশী দেরি হল না। কাছেই দমদম এরোড্রোম। ছুটো অস্ত্রবাহী গাড়িতে আমরা।

সামনে-পেছনে রাইফেল টমিগান নিয়ে ট্রাকভর্তি সশস্ত্র পুলিশের মিছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর হাওয়াই জাহাজ কোম্পানী আমাদের পৌঁছে দেবে হাসিমারায়। সাত আট কিস্তিতে বন্দীদের চালান করে ঘরে পয়সাও আসবে আর হাজার হাজার দেশের লোকের চোখের সামনে দিয়ে নির্বাসনে নিয়ে যাবার দুর্ভাবনাও জনপ্রিয় সরকারকে পোহাতে হবে না।

এক জায়গায় এতদিন বন্দী থাকবার পর ঠাঁই-নাড়া হতে এমনিতেই মন্দ লাগছিল না। হাসিমারায় এসে সত্যিই ভালো লাগল। কতদিন খোলা আকাশ দেখিনি। মনে হচ্ছিল ঝোপ-

জঙ্গল ভেঙে ছুটে পালিয়ে যাই যেদিকে দু চোখ যায়। গুলি যদি করে করুক।
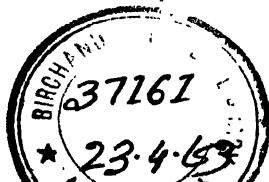
সামনে হাজির জেলখানার কয়েদ-গাড়ি। আর ডজন চারেক বন্দুকধারী পুলিশ। এখান থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মাইল যেতে হবে মোটরে।

একটু এগিয়েই দু পাশে চা-বাগান। গাঢ় সবুজ পাতির মধ্যে মধ্যে হঠাৎ ভুঁইফোঁড়ের মত উঠে দাঁড়িয়েছে একেকটা প্রকাণ্ড বনস্পতি। যেতে যেতে পাতায় ছাওয়া ছোট ছোট ঘর দেখা যায়। কুলিকামিনদের বস্তি। লোকগুলোর চেহারা দেখলেই বোঝা যায় অসম্ভব গরীব। সাঁওতাল, ওরাঁও, পলিয়া, বিলাসপুরী নানা জাতের মানুষ। অসংখ্য পুরুষমানুষ দেখলাম গায়ে কিছু নেই, পরনে শুধু একটা ছোট্ট সরু নেংটি।

মাঝে মাঝে সাহেবদের বাংলো। দেখে মনে হয় বেশ বহাল-তবিয়তেই আছে। ধুলো উড়িয়ে ছুটছে তাদের ঝকঝকে তকতকে গাড়ি। রেল-লাইনের অক্টোপাশে বাঁধা গোটা তল্লাট। লুটের মাল যাচ্ছে দেশেবিদেশে—সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে।

চা-বাগানের এলাকা ছাড়িয়ে ভাঙা মেটে রাস্তা। অসংখ্য খানাখন্দ। কুলোর ওপর ধান ঝাড়াই হলে যে অবস্থা হয়, বদ্ধ গাড়ীর মধ্যে আমাদেরও সেই দশা। গাড়ির ছাদটা যেন মাথার ওপর ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে।

সরকারী গাড়ি ছুটছে কারো জানের পরোয়া না করে। মাঝে মাঝে ভাঙা তক্তার নড়বড়ে পুল। লোকালয় অনেক্ষণ ছাড়িয়ে এসেছি। দূরের পাহাড় কাছে ঘনিয়ে এল। ধারে কাছে জন-মানব নেই। এখানে মরে পড়ে থাকলে কাকপক্ষীও টের পাবে না। রাস্তাটা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে এল। ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছি আমরা। এ হচ্ছে ডুয়ার্সের বাঘ-ডাকা জঙ্গল। চারদিক

থম্ থম্ করছে। গাড়ির শব্দ ছাড়া আর শব্দ নেই। মাঝে মাঝে ঝিপজ্জক বাঁক। জঙ্গল যেন ফুরোয় না।

হঠাৎ সামনের রাস্তাটা উঁচু হয়ে গেল। এতক্ষণ খেয়াল করিনি। সামনে তো আর পাহাড় দেখা যাচ্ছে না। মেটে রাস্তার বদলে কখন পাথরের রাজ্যে এসে পড়েছি। সামনে একটা ধোঁয়াটে ব্ল্যাকবোর্ড। তার শেষ দেখা যাচ্ছে না।

উঁচু রাস্তায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে গাড়ি এসে দাঁড়াল সান্তালবাড়ী। সামনে পুলিশের ফাঁড়ি। লোহার তারের বেড়ায় রাস্তা বন্ধ। মাঝখানে একটা ছোট ফটক।

একে একে নামলাম। নোংরা কাপড়জামা-পরা একদল ভুটিয়া মেয়ে আর বাচ্চা-বাচ্চা কয়েকটা ছেলে আমাদেরই জন্যে অপেক্ষা করছিল। শুকনো রোগাটে চেহারা। আমাদের অত লোকের লটবহর ওরাই কাঁধে করে দু-মাইল চড়াই ঠেলে পৌঁছে দেবে জেলখানায়। এখানে এই হচ্ছে ওদের রুজিরোজগারের উপায়।

অনেকখানি রাস্তা। কতদিন হাঁটার অভ্যেস নেই। তবু ভালোই লাগল হাঁটতে। বড় বড় গাছের ছায়ায় আবছা পথ। দূর থেকে একটা ঝরনার ছল্‌ছল্ শব্দ ভেসে আসছে। একে এই প্রথম পাহাড় দেখা, তার ওপর কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ইঁট আর ইস্পাতের হাত থেকে মুক্তি—কী ভালো যে লাগছিল। কিন্তু দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখার উপায় নেই। সামনে গরাদের পেছনে সশস্ত্র পুলিশের মিছিল বার বার মনে করিয়ে দেয় পাঁচিলের বাইরে এলেও আমরা বন্দী।

ঝরনা পেরিয়ে খানিকটা ওঠার পর লোকালয়ের আভাষ পাওয়া গেল। বাঁ হাতে পোস্টাপিস, একটু এগিয়ে ডান হাতে জলকল। ঝরনার জলই পাইপে করে বিলি হয় এখানে ওখানে।

লোকালয় বলতে খুবই সামান্য। সবই প্রায় সরকারী চাকুরে।

ফরেস্ট অফিস, ডাকঘর, জলকল, জেলখানা আর আই-বি—এই নিয়ে বক্সা। আর আছে এক ঘর দর্জি, দু-চারজন ঠিকেদার ব্যবসাদার। স্থানীয় বাসিন্দারা থাকে আরও ওপরে ভুটান পাহাড়ের গায়ে। তারা কেউ পল্টন, কেউ পুলিশে কাজ করে—বিদেশ-বিভুঁইতে পড়ে আছে। বাদবাকিদের কেউ ছুতোরমিস্ত্রি, কেউ ঘরামির কাজ করে। বেশির ভাগেরই মোট বওয়ার কাজ। লোকগুলো অবিশ্বাস্য রকমের গরীব। রাস্তায় আসতে আসতে দেখা যায় চার পাঁচ বছর বয়সের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভারী ভারী মোট কাঁধে নিয়ে পাথরের ওপর এলিয়ে পড়েছে। ওদের নাম সবই প্রায় এক রকম। বড় হলে জেঠা, মেজ হলে মাইলা, ছোট হলে কাঞ্ছা।

জেলখানাটা সম্পর্কে অন্য রকমের ধারণা ছিল। বাইরে থেকে দেখে সমস্ত উৎসাহ জল হয়ে গেল। সেই মোটা দেয়াল আর মাথার তিন হাত ওপরে ক্ষুদে ক্ষুদে জানলা। এবার আর ইঁট নয়, মোটা মোটা পাথর।

কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে এক টুকরো ফাঁকা মাঠ। সেখান থেকে পাথর-কাটা লম্বা সিঁড়ি উঠে গেছে তিনতলা সমান উঁচুতে। সামনেই লোহার ফটক। ততক্ষণে পথের সমস্ত আনন্দ বিস্বাদ হয়ে গেছে।

বেশ খানিকক্ষণ সময় গেল জেলের আপিসে। দমদম জেলের খরচের খাতায় নাম উঠতে যতটা সময় লেগেছিল, এখানে জমার খাতায় নাম উঠতে কিছুটা বেশী সময় নিল।

ভেতরে অনেকক্ষণ আগেই সাড়া পড়েছিল। আমরা যেতেই সবাই হৈ হৈ করে উঠল। আগের কিস্তিতে যারা এসেছে, তারা ভাবেনি ঠিক আমাদেরই সঙ্গে আবার তাদের দেখা হবে।

তিনটে ফটক পেরিয়ে তবে আমাদের আস্তানা। সমুদ্রের পিঠ থেকে আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে একটা পাহাড়ের মাথায়।

তিনটে খাঁজের ওপর ইয়ার্ডগুলো ছড়ানো। চারদিক ঘিরে মোটা পাথরের দেয়াল। তিন দিকে পাহাড়। একটা দিক খোলা। কাঁটাতার দিয়ে ভাগ করা প্রত্যেকটা উঠোন। ভেতরের সমস্ত কাঁটাতার এক সঙ্গে জুড়লে লম্বায় বেশ কয়েক মাইল হবে।

বাংলার অন্যান্য জেলের মত সেপাই, ওয়ার্ডার এখানে নেই। আর্মড্ পুলিশ এ জেলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। লাঠি নয়, বন্দুক নিয়ে তাদের কারবার।

জেলের ভেতরে ঢুকতেই নাৎসীদের কন্‌সেণ্ট্রেশন ক্যাম্পের কথা মনে পড়ে যায়। দেয়ালের গায়ে গায়ে ছোট ছোট খোঁদল। মেশিনগানের নল তাতে ঢোকানো যায়। আলো ঝোলানোর কাঠের পোস্টগুলো এমনভাবে তৈরি, একটু দূর থেকে আচম্‌কা দেখলে ফাঁসিকাঠ বলে ভুল হয়।

খেতে বসে একটু অবাক হয়ে গেলাম। নিরামিষ ব'লে শুধু নয়, তরকারী বলতে শুধু আলু আর কোয়াশ। শুনলাম জিনিস-পত্তর কিছুই পাওয়া যায় না। যাও বা পাওয়া যায় চারগুণ পাঁচগুণ দাম। আনতে হয় আলিপুর-দুয়ার কিংবা কুচবিহার থেকে। তারপর পাঁচ মাসেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। বারবার জানানো সত্ত্বেও খোরাকির ভাতা এক পয়সা বাড়েনি।

খেতে হয় ঝরনার অপরিস্রুত জল। ফুটিয়ে ছাড়া খাবার উপায় নেই। গরম জল মুখে দেওয়া যায় না।—বিচ্ছিরি বোট্‌কা গন্ধ।

বড় বড় ঘরে বাইশ চব্বিশজন ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে, ছোট ঘরে বারো তেরো জন। বর্ষায় ছাত ফুটো হয়ে অনেক ঘরেই জল পড়ে।

শীত আর বর্ষা ছাড়া ঋতু নেই। ঘর থেকে অনেকটা দূরে পায়খানা আর স্নানের কল। এদিকে প্রত্যেক দশ জনের জন্যে বরাদ্দ

একটি করে ছাতা। কাজেই ঘর থেকে বেরোতে গেলে না ভিজে উপায় নেই। যেটুকু সময় বাইরে একটু খোলা আকাশের মুখ দেখতে পাওয়া যায়, সেটুকু সময়ও বাধ্য হয়েই ঘরের মধ্যে বন্দী থাকতে হয়।

রাত্রে আলো ছাড়া এক পাও ঘরের বাইরে যাওয়া যায় না। একে পাহাড়ী জায়গা, তার ওপর চারদিকে ঝোপঝাড়। প্রায়ই সাপ বেরোয়। হাসপাতালে তো একদিন রাত্তিরে চালের ওপর থেকে এক রুগীর বুকে লাফিয়ে পড়েছিল একটা বড় গোছের সাপ। আমাদের এক বন্ধুকেও সাপে কামড়েছিল। বিষ ঢালতে পারেনি তাই বাঁচোয়া। অথচ বাইরে দূরের কথা, ঘরের ভেতরেও আলোর সুবন্দোবস্ত নেই। আগে বড় ঘরে দুটো মাত্র হ্যাজাক বাতি দিত, তাও নটা বাজতে না বাজতেই নিভে যেত। এখন শুধু মাথাপিছু একটা লণ্ঠন। হ্যাজাক বাতি দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

সাপ যদি কামড়ায় আর বিষ যদি ঢালতে পারে, তাহলে বাঁচার যে কোন আশা নেই তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। পাহারাদার সেপাইকে প্রথমত ডেকে পেতে হবে, তারপর সে যাবে চাবি আনতে। চাবি আনবার পর খবর যাবে ডাক্তারের কাছে। ঘুম থেকে উঠে অনেকটা রাস্তা হেঁটে তাঁকে আসতে হবে হাসপাতালে। সেখান থেকে ওষুধপত্র নিয়ে আবার অনেকখানি রাস্তা। ততক্ষণে রুগীর কী দশা হবে কিছু বলা যায় না।

তার ওপর যে হাসপাতাল, যে ওষুধ আর যে ডাক্তার। কয়েকটা খাট, কিছু বিছানা, বালিশ আর কিছু ওষুধপত্তর এক জায়গায় জড়ো করে তার নাম দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল। দরকারী একটা ওষুধও পাওয়া যাবে না। এর ওষুধ ওর নামে যাবে, ওর ওষুধ এর নামে। শক্ত শক্ত অসুখ যাদের, মাসের পর মাস বিনা চিকিৎসায় তারা পড়ে থাকে।

আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের কোন কথাই ওঠে না। নদী-গিরি-কান্তার পেরিয়ে কে যাবে ঐ দুর্গম জনমানবহীন দেশে ? খরচেই বা পোষাবে কেন ?

বাংলাদেশের মানচিত্রের এককোণে জায়গা পেলেও সেটা বাংলাদেশ নয়। বক্সা আসলে ভুটান রাজ্যের একটা অংশ। ইংরেজরা ইজারা নিয়েছিল বেশ একটা লম্বা মেয়াদে। বক্সার গায়ে গা দিয়ে উঠেছে ভুটান পাহাড়। তার চূড়োয় সীমান্তের ঘাঁটি দেখা যায়। রাত্তিরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে দু-চারটে ক্ষীণ আলো জানিয়ে দেয় ওখানে মানুষ আছে।

আগাছায় জঙ্গল হয়ে আছে জেলের ভেতরটা। সাপের ভয় আর বাগান করার সখ দুটোয় মিলে বন ক্রমে সাফ হয়ে আসছে। পাথরের বুকে মাথা তুলছে নানা রঙের মৌসুমী ফুল, লঙ্কাগাছ আর চাল-কুমড়ো। কাঁটাতারের গা বেয়ে উঠছে লাল টকটকে তরুলতা।

বাইরে থেকে চিঠি আসে। দু-দিনে যে চিঠি পাবার কথা, সে চিঠি পেতে সাত দিন কেন দশ দিনও লেগে যায়। হয় কাঁচি দিয়ে কাটা, নয় কালি-ধেবড়ানো সেন্সার-করা চিঠি। একমাত্র ছেলের কাছে বিধবা মায়ের চোখের জলে লেখা চিঠি। চিঠি আসে সহায়সম্বলহীন শেষ কপর্দকশূন্য স্ত্রীর কাছ থেকে—বিনা চিকিৎসায় প্রাণপ্রতিম শিশুপুত্রের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে। কাছাকাছি কোন জেলে থাকলে অন্তত শেষ দেখা দেখবারও একটা সুযোগ মিলতে পারত। এই সুদূর পাণ্ডববর্জিত দেশে তার কোন উপায় নেই। সংসারে সংসারে আগুন লাগছে, পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য জীবন।

একটা শুধু সান্ত্বনার দিক আছে—উত্তর-পশ্চিম দিক। তিন মানুষ সমান কাঁটাতারও আড়াল করতে পারেনি এই দিকের

আকাশকে। পৃথিবীতে এত রং আছে, এখানে না এলে বোঝা যায় না। মাথা উঁচু করে দেখতে হয় দিগন্তকে। হাজার হাজার ফুট নিচে বিরাট অরণ্য-অটবী আগাছার মত দেখায়। সরু সুতোর মত নদীতে যখন বর্ষার ঢল নামে, তখন মনে হয় যেন গাঢ় সবুজ জমির ওপর কেউ চওড়া জরির পাড় বুনেছে। চিত্রবিচিত্র মেঘে আলো-ছায়ার খেলা।

সেদিকে তাকিয়ে কত প্রিয়জনের মুখ মনে পড়ে। যাদের ফেলে এসেছি অনেক দূরে শহরে কিংবা গ্রামে। দুর্ভিক্ষের, দুর্যোগের খবর লেখে কাগজে। হাজারে হাজারে ছাঁটাই হচ্ছে আপিসে কারখানায়। গাঁয়ে গাঁয়ে উজাড় হচ্ছে গরীব চাষীবাসী। শেয়ালদা স্টেশনে, উদ্বাস্তুদের শিবিরে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাচ্ছে দ্বিখণ্ডিত দেশের ছিন্নমূল মানুষ। কে তাদের জীবনে আশা দেবে, কে তাদের সমস্ত মুঠো এক করে উপ্‌ড়ে দেবে শোষণের ভিৎ?

বক্‌সার নির্বাসিত মানুষেরা তাদের সেই দুঃখের জগতে একটি আশা নিয়ে বেঁচে আছে—দেশের মানুষ তাদের ভুলবে না। নিজেদের মধ্যে ফিরে পাবার জন্যে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত তারা উত্তাল হয়ে উঠবে। বিনা বিচারে মিথ্যে অভিযোগে আটক বন্দীদের নির্বাসনে পচে মরতে তারা দেবে না।
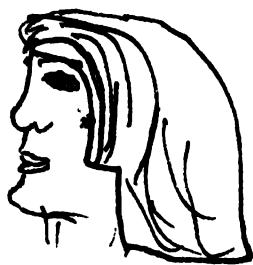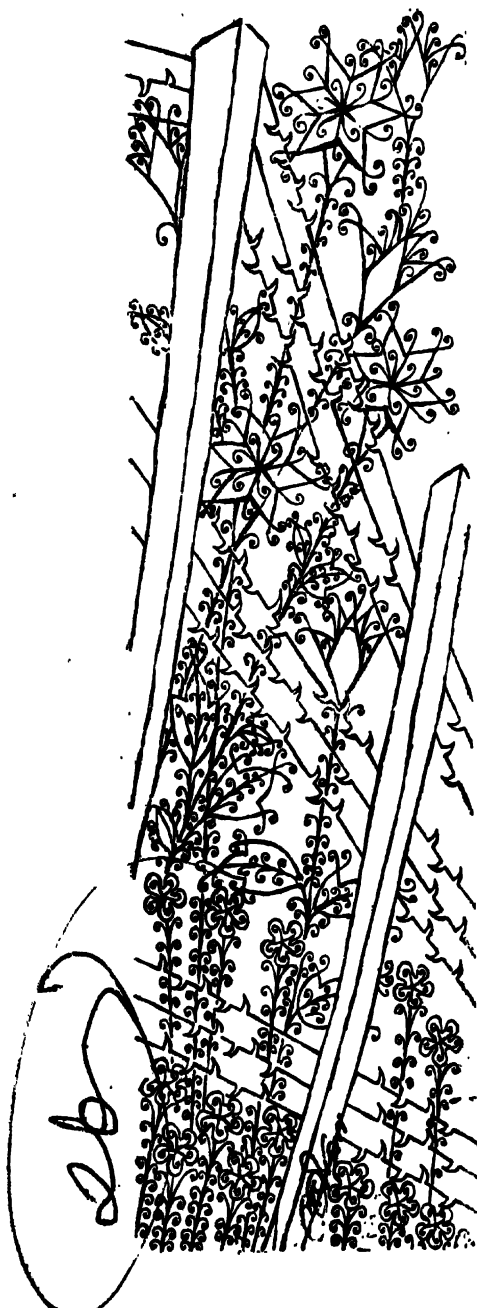
কাঁটাতারের বেড়ায়

বক্‌সার শিবির।

বিকেলবেলায় ওপর-তলার শানবাঁধানো চত্বরে এসে সবাই জমা হয়। সামনে থিয়েটারের ড্রপসিনের মত টাঙানো আকাশ। একপাশে লাগাও একটা পাহাড়ের ওপর যেন তুলি দিয়ে আঁকা পত্রপুষ্পহীন কঙ্কালসার একটা গাছ।

ছোট্ট জায়গার মধ্যে স্বাস্থ্যান্বেষীরা ঘুরপাক খাচ্ছে। বাকি সবাই ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বসেছে। যারা কিছুতেই সময় জিনিষটা

নষ্ট হতে দেবে না, তারা পুবদিকে ক্লাবঘরে বসে চার-পাঁচ দিনের বাসি 'বম্বে ক্রনিক্‌ল' কিংবা 'ফ্রী প্রেস জার্নালে'র পাতা ওল্‌টাচ্ছে।

সব থেকে জমাটি আড্ডা বসেছে খাঁ-সাহেবকে ঘিরে।

আব্দুর রেজ্জাক খান। ছ-ফুট লম্বা বলতে যদি খুব লম্বা লোক বোঝায় তাহলে বোধ হয় তিনি লম্বায় ছ-ফুটই হবেন। বাঙালীর মধ্যে সচরাচর এমন সুপুরুষ চেহারা কম চোখে পড়ে। হাতের চেটো দুটো ঠিক বাঘের থাবার মত। মুখে বার্ধক্যের বলিরেখা পড়লেও প্রত্যেকটি ভাঁজে ভাঁজে অচঞ্চল দৃঢ়তা। খোদাই-করা পাথরের মূর্তির মত সে মুখ। তার পেছনে পটভূমি হয়ে বুক টান করে দাঁড়িয়ে থাকে গম্ভীর ভুটান পাহাড়। গায়ের রং পুড়িয়ে তামাটে করে দিলেও বার্ধক্য তাঁকে বাগ মানাতে পারেনি। আজানুলম্বিত ভারী হাত দুখানা সব সময় ওঠে আর পড়ে; মনে হয় যেন এখুনি ঝড় উঠবে। ঝড় উঠলে যে কী হয়, দমদমে সে-ছবিও আমরা দেখেছি।

এমনি একজন ইস্পাত-কঠিন মানুষ, যাঁকে দেখলেই মনে হবে মাথা-নোয়ানো যাঁর কুষ্ঠীতে লেখেনি, ইচ্ছে করলেই যিনি তাঁর চারপাশে রহস্যের জাল বিছিয়ে দিতে পারেন—দিলখোলা হাসি আর প্রাণের প্রাচুর্য দিয়ে তিনি জমিয়ে রেখেছেন বক্‌সা জেল। সব কিছুর প্রাণ খাঁ-সাহেব। উৎসাহের অফুরন্ত উৎস। খাঁ-সাহেব না হলে বিশেষ দিনে ভালো-মন্দ রান্না হবে না। রাবণের চিতার মত কাঠের আঁচের উনুনের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে খুন্তি নাড়বেন খাঁ সাহেব। পরের হাতে রান্না ঠিক হয় না। তাছাড়া এতগুলো কমরেড খাবে। তাতে কোমরের ব্যথায় দু দিন যদি শুয়ে থাকতে হয় তো হবে। ফুটবল ম্যাচে খাঁ-সাহেব একদিকে, তো ক্যাম্পের সব লোক অন্যদিকে। কিন্তু খাঁ সাহেব একাই একশো। গোলের কাছাকাছি বল গেলে লাফিয়ে উঠছেন। চেঁচিয়ে হাত নেড়ে

উত্তেজিত করছেন খেলোয়াড়দের। দেখে মনে হবে যেন এই খেলাটার ওপরই তাঁর জীবন মরণ সব কিছুই নির্ভর করছে। গোল যখন খান, তখন যেন রাজ্য হারানোর মত তাঁর অবস্থা। খেলার আগে মিটিং ডেকে নিজের টিমকে তালিম দেন খাঁ-সাহেব—এমনি করে আক্রমণ চালাতে হবে। বিপক্ষের রক্ষাব্যূহ এইখানে ভেদ করতে হবে—ছক কেটে দেখিয়ে দেন। খেলার দিন খেলোয়াড়দের পেট খালি রাখতে হবে, একটু বেশী চিনি খেতে যেন ভুল না হয়। এত করেও খাঁ-সাহেব প্রত্যেক খেলাতেই হেরে যান। খেলায় তিনি হেরে গেলেও তাঁর মুখের কাছে সবাই হার মানে।

খাঁ-সাহেব বসতে না বসতে অমনি আড্ডা জমে উঠল। খাঁ সাহেবের ঘাড়টা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, চশমার ওপর দিয়ে চোখ-কপালে-তোলা তাঁর দৃষ্টি সামনে নিক্ষিপ্ত হল, ডান হাতটা খানিকটা উঠে বরাভয়ের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কাংস্য স্বর শোনা গেল—বুঝ্‌তে পেরেসেন। এইটুকু মাত্র বলে একবার ডান দিকে, একবার বাঁ দিকে খাঁ-সাহেব মাথা ঝোঁকালেন। পুরো কথা তিনি বলবেন না—খানিকটা বলবেন, খানিকটা মুখে রাখবেন। ঠিক গুছিয়ে বলতে না পেরে আবেগের তাড়নায় ছট্‌ফট্‌ করবেন, মনের কথাটা কেউ বলে দিলে নড়েচড়ে আরাম করে বসবেন। এই তিনি রাগে ফেটে পড়ছেন, এই তিনি খুশিতে উপ্‌ছে পড়ছেন। চোখে মুখে সমস্ত শরীরে সারাক্ষণ চলেছে সঞ্চারী ভাবের খেলা।

খাঁ-সাহেব বক্‌সার আদি যুগের লোক। প্রায় দু-যুগ আগে ইংরেজ সরকার এই পাণ্ডববর্জিত দেশে প্রথম যে ক'জন বেয়াড়া দেশভক্তকে নির্বাসনের দণ্ড দিয়ে পাঠায়, তাদের মধ্যে ছিলেন খাঁ-সাহেব। স্বাধীনতার জন্যে দেশে যত আন্দোলন হয়েছে, প্রত্যেকটি গণ-আন্দোলনের সঙ্গে তিনি আশৈশব জড়িত।

খিলাফতে তিনি ছিলেন, কংগ্রেসে তিনি ছিলেন, শ্রমিক আন্দোলন আর কৃষক আন্দোলনের বীজ বোনা থেকেও তিনি আছেন।

আড্ডায় ব'সে খাঁ-সাহেব পুরনো দিনের বিচিত্র কাহিনী যখন বলেন, তখন স্তম্ভিত হয়ে সবাই শোনে। সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণা ক'রে যেসব দেশপ্রাণ মানুষেরা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাদের কথা; কিসের টানে কংগ্রেস আবার মুক্তিযুদ্ধের মিলিত ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল, সেই কথা; কেমন করে গঙ্গার দু-পাশে অত্যাচার-সওয়া মানুষগুলো ধর্মঘটের আওয়াজ নিয়ে জেগে উঠল, কেমন ক'রে বাংলার অন্তর্বর্তী গ্রামে গ্রামে লালঝাণ্ডার ডাক পৌঁছে গেল—তার ইতিবৃত্ত।

খাঁ-সাহেবের দিকে তাকালে আজকাল বেশ বোঝা যায়, বাইরের কাঠামোটা কিছুটা বজায় থাকলেও, ভেতরটা ফাঁকা হয়ে আসছে। সায়টিকার ব্যথায় আজকাল প্রায়ই বিছানা নিতে হয়। সব কটা দাঁত ফেলে দিয়ে নকল দাঁত নিতে হয়েছে। এই বুড়ো বয়সে বারবার দীর্ঘ অনশন, তার ওপর রোগভোগ আর আলোবায়ু বিষাক্ত-করা অবরোধ—এখনও দেহ যে চলছে এটাই আশ্চর্য।

কিন্তু মন? অভাবের আগুনে জ্বলছে বিরাট সংসার। রোজগেরে ছেলে যক্ষ্মায় আক্রান্ত। ভেতরটা বেদনায় আকণ্ঠ নীল হয়ে গেলেও খাঁ সাহেবের পরিহাস-রসিক মুখে তার কোন ছাপ পড়ে না।

মুখচোরা মানুষ সতীশদা—'অগ্নিদিনের কথা'র সতীশ পাকড়াশী। বাংলা দেশের অর্ধশতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসই তাঁর জীবন। আড়াই বছরে বেশ বুড়িয়ে গেছেন—কিন্তু কী আশ্চর্য, চুলে পাক ধরেনি।

সতীশদা বসেন কম, হাঁটেন বেশী। সেই কবে প্রথম কৈশোরে

ঘরবাড়ির মায়া কাটিয়ে দেশ স্বাধীন করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে পথে বেরিয়েছেন, প্রতিজ্ঞা পালন না করে তাঁর বিশ্রাম নেই। চির-জীবনটাই তাঁর জেলে জেলে কাটল। যারা তাঁরই সঙ্গে একদিন পথে বেরিয়েছিল, কেউ আগে কেউ পরে সবাই ঘরে ফিরেছে। অনেকে তাদের অতীতের নির্যাতনের পুঁজি ভাঙিয়ে গাড়ি করেছে বাড়ি করেছে আর যৌবনটা মাটি হল ব'লে জীবনের অস্তাচলটা নানা রঙে রাঙিয়ে তুলছে।

ভালবাসা কতটা গভীর হলে তবে আজীবন লাঞ্ছিত ষাট বছর বয়সেও দেশের জন্যে, শুধু দেশের হতভাগ্য মানুষগুলোর জন্যে দু চোখের জ্যোতি আস্তে আস্তে ম্লান করে দেওয়া যায়, জরাগ্রস্ত গায়ের চামড়ায় পরমায়ু ছোট করে আনা যায় এবং তারপরও নতুন জীবনের আশায় আশান্বিত হওয়া যায়, উদ্দীপ্ত হওয়া যায় যৌবন-দৃপ্ত উৎসাহে।

পাহাড়ী রাস্তা ঠেলে অনবরত ওপর-নিচ করছেন সতীশদা। কার একটু জ্বর, বাড়ি থেকে খারাপ খবর কিংবা দু-দিন দেখা নেই—ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ করতে করতে সতীশদা চললেন। জেলের মধ্যে কোন্ দুঃখ কোন সময় কোথা দিয়ে আসে অনেক সময় ধরা যায় না—সে সময় এমনি হৃদয়বান একজন মানুষের সান্নিধ্য খুব শান্তি দেয়।

সতীশদার কাছে তাঁর কারা-জীবনের ইতিহাস শুনতে বেশ লাগে। সবাই গোল হয়ে ঘিরে বসবে তাঁকে, তিনি সে-কালের গল্প বলবেন—এভাবে সতীশদা বলতে পারেন না। কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি বলবেন গল্প। জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীরা প্রথম কেমন করে লড়াই করেছিল তার গল্প। সে কি আজকের কথা? রাজনৈতিক কারণে সাজা হলেও চোর-ডাকাতদের সঙ্গে কোন তফাৎ থাকত না। ঘানি-টানা, গম-পেষা, দড়ি-বোনা

সব কাজই করতে হত। ময়লা জলের নালা থেকে 'তোল্ বাটি, ঢাল্ মাথায়' বলার তালে তালে স্নান। পান থেকে চুন খসলে বুট সুদ্ধ লাথি, কথার পিঠে কথা বললে কম্বল-ধোলাই। ভোর বেলায় ফাইলে দাঁড়িয়ে সরকার-সেলাম। সে সময় স্বদেশি করে কজন আর জেলে যায়? তবু সেই আঙুলে-গোণা মানুষগুলোই প্রথমে বিক্ষুব্ধ হল, পরে বেঁকে দাঁড়াল। না, রাজনৈতিক বন্দীদের দিয়ে সরকার-সেলাম দেওয়ানো চলবে না। অনেক বুকের পাটা দরকার হত তখন। একা একাই দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়তে হবে। বাইরে দেশের মানুষ সে লড়াইয়ের কথা জানবে না। হার অবধারিত। আর শাস্তিও তেমনি চরম। খাড়া হাতকড়া দিয়ে মাসের পর মাস ফেলে রাখবে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়ানো অবস্থায় হাত দুটো মাথার ওপর বাঁধা থাকবে, পা দুটো লোহার আংটায় আটকানো থাকবে। বছরের পর বছর পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে রাখবে। অন্ধকারে নির্জন কুঠরিতে ফেলে রাখবে মাসের পর মাস—দ্বিতীয় কোন মানুষের মুখ দেখা যাবে না। এত কঠিন শাস্তিতেও বন্দীদের লড়াই কখনও থামেনি। জেলের মধ্যে সেই প্রথম সংগ্রামীদের একজন সতীশদা।

সতীশদা বলেন, সে যুগে বই-কাগজ কিছুই আমরা পেতাম না। মন যখন খারাপ হত স্বদেশী গান গাইতাম।

রবি ঠাকুরের কবিতার দু-চার ছত্র আপন মনে আবৃত্তি করতাম—তাতে থাকত বাংলার জল-মাটি-আকাশের কথা।

ভালো লাগত খুব, মনে জোর পেতাম।—

সেই ভালো লাগাটা এখনও থেকে গেছে। ততক্ষণে সতীশদা হয়তো আকাশে কোন একটা রং দেখে কাঁটাতারটার কাছে এক মিনিট থম্‌কে দাঁড়িয়েছেন। তারপরই আবার কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে হাঁটতে কথা শুরু হয়। অতীত নয়,

বর্তমান। ভারতবর্ষ, চীন। পথের ভুল তাঁকে কখনও গ্রাস করতে পারেনি।

বার বার তিনি নিজেকে অতিক্রম করে চলেছেন।

উঠোনের এককোণে হিন্দী কাগজ নিয়ে বসেছে একদল। ট্রামের মিসিরজী, পোর্টের রামদেও, রামসুরত, ইলেকট্রিকের মার্কণ্ডেয়, রেশনিং-এর সমর গুপ্ত, রেলের রামপ্রসাদ, আরও অনেকে। কোন্ এক কাগজের রবিবাসরীয় থেকে কবিতা পড়ার পর আলোচনা চলছে।

বেশীর ভাগই মজুর কমরেড। কেউ দু-বছর, কেউ আড়াই বছর ধরে জেলে আছে। নিজেরা দুঃখে পুড়ে আন্দোলনে এসেছিল। লড়াই করে বাঁচবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর সহকর্মী মানুষগুলোর প্রতি অসীম ভালবাসা—এই ছিল একমাত্র পুঁজি। কিন্তু যে অস্ত্র আয়ত্ত করতে না পারলে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়, বীরত্ব বৃথা যায়—সেই অস্ত্রের পরিচয় তারা জেলে এসে পেয়েছে। কষ্ট ক'রে ভাষা শিখেছে, আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বই পড়েছে। ব্যাপ্ত হয়েছে তাদের বিশ্ববোধ। পৃথিবীর নতুন সংস্কৃতির অধিকারী শ্রমিক শ্রেণী—একথা বুঝেছে বলেই আজ সাহিত্যেও তাদের আগ্রহের অন্ত নেই।

রামসুরত প্রায়ই বলত, তোমরা সব আমাদের বোকা ক'রে রেখেছ। নিজেরা বড় বড় ইংরেজি কেতাব পড়, কী বল কিচ্ছু বুঝি না। বইগুলো তর্জমা কর না কেন? তাহলে তো আমরাও পড়তে পারি।

রামসুরত আন্দোলনে এসেছিল একটু অদ্ভুত রকমে। বস্তিতে মজুরদেরই সঙ্গে থাকত বটে, কিন্তু প্রথম জীবনে সে ছিল মজুরদের সর্দার। স্টিভেডোরদের মজুর যোগান দিত। নিজে খেটে নয়,

অন্যদের খাটিয়ে তার পয়সা। যুদ্ধের সময় দু-হাতে পয়সা পেয়েছে। বাবুগিরিও কম করেনি। কিন্তু একজন মানুষের সংস্পর্শে এসে জীবনটা একদম বদ্‌লে গেল। জীবনের গ্লানির দিকটা দেখে দেখে মনের মধ্যে যে ঘৃণার বারুদ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল আগুনের সামান্যতম স্পর্শে তাতে বিস্ফোরণ ঘটল। টাকার নেশা, নীড়-বাঁধার স্বপ্ন সব তুচ্ছ হয়ে গেল। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে আন্দোলনে আকণ্ঠ ডুবে গেল সে।

ধুত্তেরিকা—রামদেওকে দেখলেই সবাই চেঁচিয়ে ওঠে। গোল-গাল লাল টুকটুকে চেহারা। হিন্দীর টানে বাংলা বলে—'কোথা যাচ্ছো রে বাবা।' পোর্ট রেলের কোন কেবিনে যেন কাজ করত —সবাই ঠাট্টা ক'রে বলে 'হ্যালো, হ্যালো'র কাজ। জেলে বসে নিজের চেষ্টায় চমৎকার বাংলা শিখেছে রামদেও। এখন কারো সাহায্য না নিয়েই 'পরিচয়' পড়ে এবং অধিকাংশই বোঝে। অল্পদিন হল ইংরেজি নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। এরই মধ্যে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। রামদেও, রামস্বরতের পড়াশুনোটা যেন নেশার মত।

স্নানের ঘরে রামদেও ঢুকলেই রোজ টিনের চালে ভুতুড়ে কাণ্ড শুরু হয়ে যায়। ভূতটাও আবার ট্রামেরই একজন ভূতপূর্ব শ্রমিক—কালীদা। এককালে সোশ্যালিস্টদের একজন চাঁই ছিলেন কালীদা। দেশের দুশমন, বৃটিশের দালাল বলে একদা আমাদের অনেকের পিঠেই লাঠি ভেঙেছেন। বললে এখন লজ্জা পান কালীদা। সকালে তেল মেখে আধ ঘণ্টা ধরে ডন-বৈঠক দেওয়া চাই। ব্যায়াম করার মতই দশাসই চেহারা। কিন্তু আশ্চর্য শান্ত এবং স্নিগ্ধ প্রকৃতির মানুষ। দেখে মনেই হয় না এই লোকটারই মাংসপেশীগুলো কখনও রাগে ফুলে উঠতে পারে।

চুলগুলো পেকে যাচ্ছে মিসিরজীর। অল্প বয়সী ছেলেরা

মিসিরজীকে ক্ষ্যাপায়। হাঙ্গার-স্ট্রাইকের সময় দুর্বল মুহূর্তে মিসিরজী বলে ফেলেছিলেন তাঁর জীবনের কী একটা গল্প। এখন বড় ফ্যাসাদে পড়ে গেছেন।

সাহিত্য পড়তে ভালবাসেন মিসিরজী। এমন কি পরভেজের দুরূহ উর্দু কবিতারও তিনি মর্ম গ্রহণ করতে পারেন। যারা শুনেছে তারা কখনও ভুলবে না গোর্কী-দিবসে সভাপতি হিসেবে মিসিরজীর অল্পকথার অন্তরস্পর্শী ভাষণ। গোর্কীর 'মা' কেমন লেগেছে—এই ছিল তাঁর বলবার কথা। মিলের ভোঁ বাজলে মজুরের মন কেমন ক'রে ওঠে, নিজেকে ক্ষয় ক'রে দেবার নেশা কেমন ক'রে পেয়ে বসে, তারপর কিভাবে লড়াই ক'রে বাঁচার সংকল্প রক্তমাংসের শরীর নেয়—নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সেই কাহিনী মিসিরজী দুচার কথায় ফুটিয়ে তুললেন।

হাসপাতাল থেকে ইন্‌জেকশন নিয়ে ফিরছে পরভেজ শহীদী। দূর থেকে দেখেই হিন্দী কবিতা-পাঠকদের চক্রে ডাক পড়ল।

পরভেজের পেশা অধ্যাপনা। কলকাতার কোন নামকরা কলেজে উর্দু, আরবী, ফারসী সবই পড়াতে হত। কিন্তু নেশা হচ্ছে কবিতার। পেশার চেয়ে নেশাটাই বড়। আধুনিক উর্দু সাহিত্যে খুব নামডাক। দূর দূর থেকে মুশায়রার জন্যে ডাক আসত। কলকাতার উর্দু শ্রোতারা শুনেছি পরভেজ বলতে অজ্ঞান।

দূর থেকে দেখলেই বলে দেওয়া যায় পরভেজ কবি। লম্বা লম্বা তেল না-দেওয়া রুক্ষ সোনালী চুল। দু-এক গোছা রুপালী। তাতে কালেভদ্রে চিরুনি চলে। জ্বল্ জ্বল্ করছে দুটো চোখ। দৈবাৎ পর পর দু-দিন স্নান করলে পরভেজ দুশ্চিন্তায় পড়ে—এই বুঝি বিচ্ছিরি বদ্-অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। পরনে ময়লা তেলচিটে

শার্ট আর পা-জামা। মুখে সব সময় অট্টহাসি। কথায় বেহারী টান। বাংলা লিখতে পড়তে জানলেও বলাটা এখনও সড়গড় হয়নি। বাংলায় কথা বলতে গেলে তোতলায়।

সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে একটি কবিতা সম্বন্ধে পরভেজ কী মত দেয় শোনার জন্যে। পরভেজ পড়ে বলল, 'কিচ্ছু হয়নি।'

যারা এতক্ষণ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিল, তারা দমে যায়। 'কেন প্রগতি আছে তো?' 'তা আছে, কিন্তু কবিতা নেই।' বাঁধাগতের ছকে-ফেলা কবিতা দেখলে পরভেজ চটে যায়। প্রাণ কোথায়? পাঁচটা ইন্দ্রিয় কোথায়?

পরভেজের কথা কেউ ফেলতে পারে না। কেননা এই মানুষটাই যেকোন অনুষ্ঠানে যখন কবিতা পড়তে ওঠে, তখন শ্রোতার দল চঞ্চল হয়ে ওঠে, হাততালি থামতে চায় না।

যখন তার ভারী গলায় গম্‌গম্‌ করতে থাকে—

নববধূ শান্তির হাতের লাল কাঁকনের রিণি রিণি শব্দ শোনো
বাজুবন্ধে তার মুখরিত লাবণ্যগাথা।
কামনার উদ্যান ভুর ভুর করছে মিষ্টি গন্ধে,
সিঁথিতে তার পুজোয় বসেছে ছায়াপথ।
আকাঙ্ক্ষা তার একাগ্র, যৌবনোদ্দীপ্ত তার অভিলাষ
অসংকোচ চিরবসন্ত তার শোভা—
জিম্ ক্রো-র চক্রান্তে বিহ্বল হবে না সে।...

কিংবা—

কুতূহলী সেখানে প্রত্যেকটি চোখ,
ভালবাসায় ভরা প্রত্যেকটি হৃদয়।

যেদিকেই তাকাও দেখবে আরক্তিম আভা,
যেখানেই যাও বসন্ত।…

চমৎকার গল্প বলতে পারে পরভেজ। হাসতে হাসতে পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যায়। অনুরোধে প'ড়ে বারবার বলতে হয়। দুই জুয়াড়ীর গল্প, সৎ পাত্রের গল্প—এমনি কয়েকটা। তাছাড়া ছুট্‌কো ছাট্‌কাও আছে। লখ্‌নৌতে স্পোর্টস্‌ হয় না কেন? দিল্লীতে বলদেও সিংকে নিয়ে কী ঘটনা ঘটেছিল? এই সব। তাছাড়া দাবা খেলায় কেউ এঁটে উঠতে পারে না পরভেজের সঙ্গে। তার সঙ্গে চাল ফেরত নিয়ে খেলা নেই।

অধ্যাপক, কবি এবং সবচেয়ে বড় পরিচয় তার মহান হৃদয়। কোন্‌ অভিযোগে তাকে দু-বছর ধরে বিনা বিচারে আট্‌কে রাখা হয়েছে, জানেন? পরভেজ নাকি কলকাতায় পাঁচ মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে নেহেরুর দিকে জুতো ছোঁড়ার জন্যে লোকজনকে উস্কে গভর্ণমেণ্টকে গদিচ্যুত করার কথা ভেবেছিল! ভেবেছিল নাকি!

উঁচু মত বেদীটার কাছে অল্প বয়সীদের আড্ডা বসেছে। বড়রা ওদের নাম দিয়েছে ছোকরা ফাইল। কখনও টেস্ট ম্যাচ, কখনও কনট্রাক্ট ব্রিজের ভিয়েনা-পদ্ধতি, কখনও নয়া-গণতন্ত্র, মাও সে-তুং—কথার স্রোতে যখন যেটা ভেসে আসছে। বুদ্ধিদীপ্ত, প্রাণবন্ত ছেলেরা। লড়াইয়ের সময় প্রাণ দিয়ে লড়াই করে, খেলার সময় প্রাণ দিয়ে খেলে। ওদের সামনে একটুখানি মুখ ভার করে থাকার উপায় নেই। না হাসলে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবে। অরুণ সেন মাঝরাত্রে উঠে মশারী তুলে সাপের ভয় দেখাবে, কৌস্তুভ দল পাকিয়ে চ্যাংদোলা করে গায়ে কাদা মাখাবে। সারাদিন লোকের পেছনে লেগে রাত্রে কাগজ পুড়িয়ে চা তৈরি করে সারারাত জেগে বই পড়বে।

'কী বুঝলেন?'—কঠিন দার্শনিকের প্রশ্ন। মাথায় ভয়ংকর বেঁটে, পরনে হাফ প্যাণ্ট। মুখে পাইপ, ভাঁটার মত গোল-গোল চোখ। কাকের মত মাথা নাড়তে নাড়তে চারু মজুমদারের প্রবেশ। অমনি সবাই কোরাসে বলে উঠল, 'মত আছে, মত আছে।' এসে বিপদে পড়লেন চারুবাবু। গল্প বলতে হবে। তে-ভাগার গল্প।

বলব-না বলব-না ব'লে গল্প শুরু হয়। জলপাইগুড়ির চাষী। ছোট ছোট গাছের ঝোপ। কাঁটা গাছ, বেত গাছ, নীল মৌসুমী ফুলের গাছ। প্রায় বাড়িতেই সুপুরির বাগান। গায়ে গায়ে লতানো গাছ-পান। নদীবহুল দেশ। পায়ের পাতা ডোবানো সরু অগভীর পাহাড়ী নদী। বর্ষার জলে ভেসে যায়। চষা ভুঁই। মধ্যে মধ্যে ডাঙা। যেসব ডাঙায় খড় শুকানো হয় সেই-সব খড়-বাড়ি। জমিগুলো আল-বাঁধা, সমতল; উত্তরে হিমালয়—কালো মেঘের মত। করতোয়া বড় নদী, কোমর পর্যন্ত জল। গ্রাম বলে কিছু নেই। কয়েকটি বাড়ি নিয়ে একেকটি টাড়ি। বাড়ি বলতে একটা ঘর, একটা রান্নাঘর আর গোয়াল। ঘরের মধ্যে মাচা করে শোয়। শিকের ওপর কয়েকটা হাঁড়ি—কোনটাতে বীজধান, কোনটাতে দই কিংবা চিড়ে। একটু মাঝারি চাষীদের ঘরে কাঠের বাক্স। চটের ওপর ছেঁড়া কাপড় পেতে বিছানা। প্রত্যেক বাড়িতে একটা করে মাটির কুয়ো—এ অঞ্চলে বলে 'চুয়া'। চৈত্র মাসে জল থাকে না। ঘোলাটে জল। শীতকালে ভাতের সঙ্গে লাফা শাক আর বর্ষার পাটপাতা। লাফা শাক শল্‌শলা ধরনের—জলে সেদ্ধ করে কিছুটা ক্ষার দেয়। তার সঙ্গে লঙ্কাপোড়া আর নুন।

এর পর শুরু হয় দুখন্তির গল্প। গল্প নয়, সত্যিকারের জীবন। বোকা-হাবা মানুষটা। তার প্রেম। তারপর তে-

ডাগায় জলে ওঠার কাহিনী। উত্তর বাংলার চাষীদের মুখের ভাষা চমৎকার বলেন চারুবাবু। মানুষগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে। দীর্ঘ দিন তাদের মধ্যে না কাটালে, অন্তর দিয়ে মানুষগুলোকে ভালো না বাসলে এমনভাবে গল্প বলা যায় না। রাগ হয় চারুবাবুর ওপর। কেন লেখেন না তিনি সত্যিকারের এই সব গল্প?

বলতে বলতে হঠাৎ উঠে যান চারুবাবু। মন কেমন করে মানুষগুলোর জন্যে। আবার আকাশ কালো করে নামছে আকাল। কে তাদের বাঁচার রাস্তা দেখাবে?

সারা দুপুর পড়াশুনা ক'রে একটু ঘুরতে বেরিয়েছেন চিনুবাবু। চিন্মোহন সেহানবীশ। ঘরের গোলমালের মধ্যে গেরিলা কায়দায় পড়তে হয় তাঁকে। একটা করে তিনি গল্প ছাড়েন, হাসির হর্‌রা ছোটে দশ মিনিটের মত। সেই ফাঁকে দশ পাতা পড়ে নেন তিনি। গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার তাঁর। পিস্‌তুতো ভাই, হাবুলদা, পঙ্কুবাবু, ব্রাহ্ম-সমাজ—এই সব নিয়ে তাঁর গল্প। উঠতে বসতে এমন লাগসই ক'রে বলেন। পিসেমশাই কেমন করে শাস্তি দিতেন—লু চলছে এই রকম গরমে ঠিক দুপুর বেলায় দোতলার খোলা ছাদে খোয়ার ওপর ছেলেদের ফেলে হামাগুড়ি দেওয়াতেন এবং তাদের পিঠের ওপর তিনি ব'সে হ্যাট্ হ্যাট্ করতেন। তাঁর মাথার ওপর থাকত ভিজে গামছা। সাইকেলে উঠে ফুল্ স্পীডে সাংঘাতিক 'কলিশন কলিশন' খেলা। শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

চিনুবাবুকে দেখেই একদল ধ'রে বসে—'টেকো-বোকা নাপিতের গল্পটা বলে যান।' একটাতে রেহাই নেই। আরও একটা বলতে হয়।

'এক ইটালিয়ানে আর এক ভারতীয়ে কথা হচ্ছে। ইটালিয়ান বলে, দেখ, আমাদের সভ্যতা অনেক দিনের পুরনো। কিছু দিন

আগে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একদম তলার দিকে কী পাওয়া গেছে জানো? তামার তার। তা থেকে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় যে, হাজার হাজার বছর আগে আমাদের দেশে টেলিগ্রাফ ছিল। ভারতীয়টি তখন বলে—আমাদের সভ্যতা তার চেয়েও পুরনো। আমাদের দেশে অনেক, অনেক নিচে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে কী পাওয়া গেল? কিছুই পাওয়া গেল না। তা থেকে কী প্রমাণ হয়? আমাদের দেশে এক কালে ছিল বেতার।' বার বার শুনেও হেসে গড়িয়ে পড়ে সবাই।

কাজ ছাড়া একদণ্ড বসে থাকতে পারে না দাড়িবাবা—হুগলীর গিরিজা মুখার্জী। দাড়ি কাটে না কেন বললে হাত দিয়ে দাড়ি ঢেকে দেখিয়ে দেবে কতটুকু মুখ। ঐটুকু মুখ দেখে পাছে কেউ না মানে সেই জন্যে দাড়ি রেখে ভারিক্কি সাজা। কিন্তু এমন বহুগুণে গুণবান পুরুষ সচরাচর দেখা যায় না। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই নখের ডগায়। প্যাকিং বাক্সের কাঠ দিয়ে এমন রংচঙে স্যুটকেস বানিয়ে দেবে যে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। দেখে মনে হবে হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল থেকে কেনা। জেলখানার এ তল্লাটে না পাওয়া যায় সেলাইকল, হাতুড়ি, না ছুরি কিংবা ছেনি। এসব যন্ত্রপাতি ছাড়াই তৈরি হয় হাতে তৈরি বুশশার্ট, কেরোসিন কাঠের টিপয়, সিগারেটের হোলডার, থিয়েটারের খাপসুদ্ধ তলোয়ার, আলেকজাণ্ডার আর পুরুর মাথার টুপি।

কাজ করতে করতে হেঁড়ে গলায় গান ধরে দাড়িবাবা—'ওমা তোমার দুষ্টু ছেলে কাজি পাড়ায় গিয়ে ডিম খেয়েছে।'

কংকালসার চেহারা। হাড় আর চামড়ার মাঝখানে কিছু

আছে বলে মনে হয় না। সে না হলে রস্থইঘর কানা। সকলের শেষে ঘুমোয়, সকলের আগে ওঠে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। চায়ের ঘণ্টা পড়তে একে একে সব উঠে পড়ে। পেছনে মেঘ আর কুয়াশায় ভুটান পাহাড় দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে অদৃশ্য যে পথটা তিব্বতের দিকে চলে গেছে, তার পার্শ্ববর্তী দু-একটি জনপদের আলো দেখা যাচ্ছে। পাহাড়টার একেবারে মাথার ওপর সীমান্ত ঘাঁটির ক্ষীণ বাতি।
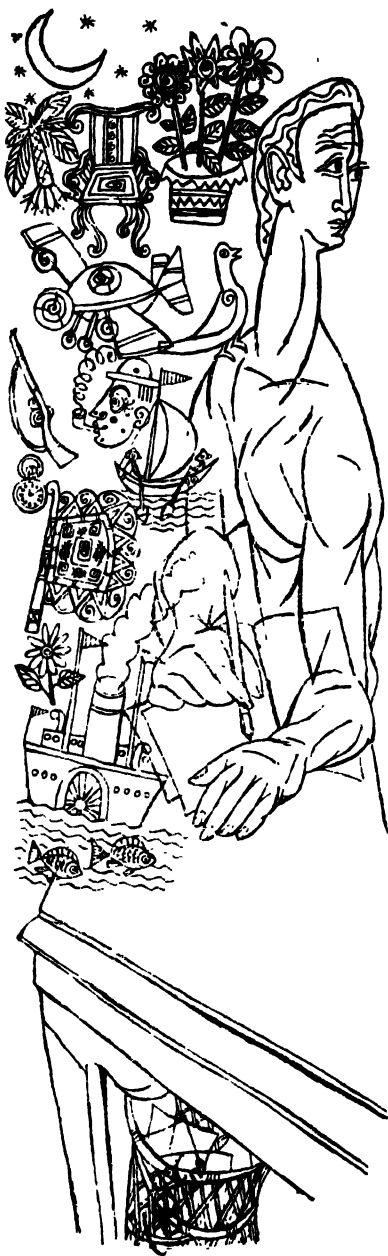
বজবজের যে-কোন সকাল

মড়ক লেগে পাড়ার মোরগগুলো সব সাফ হয়ে গেছে।

তাই ঘাটে ঘাটে ডাঁই ডাঁই পোড়া বাসনে জোরে জোরে ঝামা ঘষার শব্দে, এক কোমর জলে একসঙ্গে অনেকগুলো হাতে গামছা আছড়ানোর শব্দে এ-গাঁয়ে হঠাৎ ঝপ্ করে সকাল হবে।

পুকুরটা আকণ্ঠ বুঁজে আছে পাতা-পচা ছ্যাৎলায়। জলের ওপর যেন কেউ বিছিয়ে দিয়েছে একটা তেলচিটে চাদর। তার মাঝখানে মাঝখানে

বিজগুড়ি কাটছে বেলফুলের কুঁড়ির মত অসংখ্য বুদ্‌বুদ্‌। তাদের গায়ে চিক্‌চিক্‌ করছে বাঁশবাগানের ফাঁক দিয়ে গলে-আসা ফালি ফালি রোদ্দুর।

কখনও অনেক দূরে, কখনও কাছে কানে ভোঁ-লাগার মত থেকে থেকে বেজে উঠবে কারখানার বাঁশী। ঠিক সেই সময় গাছের ডালে যদি একটা কোকিল ডেকে ডেকে মরেও যায়, তবু সে চিৎকার কারো কানে যাবে না।

আট্‌টায় চালু-বাঁশী। যারা কাজে যাবে, তারা জলে ঝাপ্টা দিয়ে দিয়ে সরিয়ে দেয় গ্যাঁজ্‌লাগুলো। নইলে ডুব দিয়ে উঠলে সারা গা সবুজ হয়ে যাবে।

আগে থেকে গিয়ে যাদের মেশিন ঝাড়পুঁছ করে নিতে হবে, তারা পোয়া-বাঁশী বাজবার আগেই বেরিয়ে পড়বে। ক্রমেই ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকবে চড়িয়ালের রাস্তায় হাফ-প্যাণ্টপরা কোমরে-গামছা-বাঁধা মানুষের এক দীর্ঘ মিছিল। কারো হাতে ঝোলানো টিফিনের বাক্স, কারো কোঁচড়ে পুট্‌লী-বাঁধা শুক্‌নো মুড়ি। হাত মোছার জন্যে দড়িতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে কেউ কাটা-ছেঁড়া পাটের পাকানো বাণ্ডিল। কারো ট্যাঁকে ঝুল্‌ছে ধারালো উলঙ্গ ছুরি। চটকলে কাজ করতে করতে লাগে।

মোড়ে মোড়ে শাখানদীর মত ভাগ হয়ে যাবে এককেটি দঙ্গল। কেউ যাবে তেল-ডিপোয়, কেউ ঠিকে কাজে। যাদের এখনও ইস্কুলে পড়বার বয়স, গোঁফের রেখা উঠতে ঢের বাকি—তারাও সেই সকালের মিছিলে সার দেবে। আর যাবে গাঁ-থেকে আসা স্বামীপুত্রহীন নিরুপায় কিছু মেয়ে; হয় কয়লা কুড়োতে, নয় মাটি কাটতে। সেইসঙ্গে গাঁয়ের রাস্তায় লাঠি ঠুকতে ঠুকতে টুক্‌ টুক্‌ করে ভিক্ষেয় বেরোবে মাজা-ভাঙা একদল বুড়ি—তিনকাল গিয়ে যারা এককালে এসে ঠেকেছে।

সব চেয়ে ভারী মিছিলটা চটকলের হাঁ-মুখের মধ্যে ঢুকে যাবে। একদল গিয়েই একটু পরে আবার বেরিয়ে আসবে। কাজ নেই। অস্থায়ী বদ্‌লিওয়ালা তারা। কাজ পাক্‌ না-পাক্‌, রোজ দু-বেলা হাজরি দিতে হবে তাদের। টিকিট পায় না তারা, খাতাতেও হয়ত নাম নেই। বছরের পর বছর এমনি করে কেটে যাবে, মাথার চুল পেকে যাবে—তবু পাকা কাজ জুটবে না তাদের কপালে। এখানে সেখানে যাদের ঠিকে কাজ, তাদেরও ঐ এক দশা। চালু-বাঁশী বেজে গেলে হাতে টিফিনের বাক্স নিয়ে সর্দার আর বাবুদের গুষ্টিনাশ করতে করতে সকালের একটা মিছিল ঘাড় গুঁজে আবার গাঁয়ে ফিরবে।

আ-তু। আ-তু। আ-তু।

প্যাঁক্‌ প্যাঁক্‌ করতে করতে আশপাশের বাড়ি থেকে একদল হাঁস মহা উল্লাসে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

তারপর একজন একজন করে গাঁয়ে ঢুকবে ফেরিওয়ালা। হাঁক দেবার সময় কেরোসিনতেল-ওয়ালা সংক্ষেপে বলবে 'কা-চিন্‌'। আইস্‌ক্রিম বেচতে এসে ছোট্ট ছেলেটি রাস্তার মধ্যে বসে গালে হাত দিয়ে গুলিখেলা দেখবে। ঘণ্টা নাড়াতে নাড়াতে গোলাপী রঙের 'বুড়ীর চুল' বেচতে আসবে দেহাতী এক মিঠাইওয়ালা। যে লোকটা হরিদাসের কুড়মুড় কুড়মুড় ভাজা বেচতে আসবে, তার সুন্দর গানের গলা। অনেকক্ষণ শুনেও আপনি ঠিক ধরতে পারবেন না, কে বেচছে দই আর কে গোস্ত। কিনতেও আসবে কিছু লোক। ভাঙা লোহা-পেতল। নিমের দাঁতন। ঝাঁটার কাঠি। হাঁস-মুরগী।

যাদের গোরু আছে, তাদের বাড়ির ছোট ছোট মেয়েরা খুঁটি আর দড়া হাতে নিয়ে গোরু চরাতে যাবে ময়লা-ডিপোয় কিংবা জলার মাঠে। হাঁড়ি বগলে নিয়ে খালে মাছ ধরতে যাবে দল বেঁধে

পাড়ার গিন্নিবান্নি মেয়েরা। খালি বাড়ি পাহারা দেবে লোম-ওঠা ঘেয়ো কুকুরগুলো।

এমনি এক সকালে ঘুম ভাঙুক বজবজের সেই গাঁয়ে।

যদি আড়ামোড়া ভাঙতে হয়, ভুলেও যেন পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবেন না। ছাদ বেজায় নিচু। চ্যালা চ্যালা আখাম্বা কড়িকাঠে আচমকা মাথা ঠুকে যাবার বিলক্ষণ ভয় আছে।

তার চেয়ে বিছানায় সাড়ে তিন হাত লম্বা হয়ে দেখুন কড়ি-কাঠের গা ঘেঁষে সামনের দেয়ালে সবুজে-কালোয় সারবন্দী ছবি। যুদ্ধের একদম গোড়ার দিকে ব্ল্যাকের বাজারে যখন এই ঘর উঠেছিল, তখনকার আঁকা। শস্তার রং এরই মধ্যে ফিকে হয়ে এসেছে। পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের নখের আঁচড়ে দু-একটা ছবির দাগ পর্যন্ত মুছে গেছে।

গ্রামদেশের কোন নামগোত্রহীন শিল্পী হয়তো এঁকেছিল এই ছবি। ছবি ঠিক বলা যায় না; চিত্রবিচিত্র নক্সা। ওপর-নিচে লতাপাতা কাটা। মাঝখানের লম্বালম্বি শাদা জায়গাটুকুতে রকমারি জিনিস ঠাসাঠাসি করে আছে। পাতাসুদ্ধ ডালভাঙা একটা সূর্যমুখী। তার পাশে ঝালর-দেওয়া বেতের প্রকাণ্ড একটা চৌকো হাতপাখা। নিচে লতাপাতার লাইনে গিয়ে চড়াও হয়েছে তার লম্বা ডাঁটি। হাতপাখাটার হাঁটুর কাছে জলে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে একটা নেহাৎ নাবালক ইস্টিমার। তার এক হাত দূরে কুলুঙ্গিটা ছাড়িয়ে বিরাটবপু একটি 'পকেট ঘড়ি'। তার ঠিক পাশেই বিশদাঁড়ি নৌকোর মত চাঁদ, তার মাথায় দাঁড়িয়ে একা অবাক একটি তারা। এদের নিচে ঘাড় হেঁট করে আছে মানোয়ারী জাহাজ, একটি ত্রিভঙ্গ বন্দুক এবং হাড়গিলে পাখির মত দেখতে একটি উড়ুক্কু বোমারু বিমান।

আর আছে টবে-বসানো পাতাবাহার, সত্যিমিথ্যে ফুল, শেকড়-বার-করা তাল-নারকেল-খেজুর, দু-চাকার ছেলে-ভোলানো সাইকেল আর শিল্পীর স্বকপোলকল্পিত বাষ্পচালিত এক শকট।—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত একই ছবি। তবু পুনরুক্তি বলে মনে হবে না। পাশা-পাশি থাকবার কোন সঙ্গত কারণ নেই, তবু চাঁদ তারা বন্দুক ফুল জাহাজ উড়োজাহাজ লতা-পাতা নিজেদের মধ্যে একটা অনাক্রমণ চুক্তি করে নিয়েছে। তাই খুব বিসদৃশ লাগবে না। মনে হবে গ্রাম্যশিল্পীর এক গভীর জীবন-জিজ্ঞাসায় তারা পরস্পরকে জড়াজড়ি ক'রে আছে।

বাঁদিকে ভেতরে যাবার দরজা। শাড়ির চওড়া পাড়ের মত এক ফালি উঠোন। সজ্‌নে গাছের পাতা-খসা ভুতুড়ে ডালের নিচে টিনের চালে ঢেউ খেল্‌ছে হাত কয়েক রোদ্দুর। টিনের চাল যেখানে গড়িয়ে গিয়ে আচম্‌কা থেমে গেছে, তার নিচে মাকড়সার জালে আটকা পড়েছে ডজন ডজন শুঁয়োপোকা। দেখে বোঝা যাবে না কোন্‌টা মরা, কোন্‌টা জ্যান্ত।

মুছে-যাওয়া ছবিটার পাশে দেয়াল যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে বাঁশের বেড়ার অবরোধ পেরিয়ে আঁশফল গাছের ডালপাতায় মুখ-আড়াল-করা দক্ষিণের অবারিত আকাশ। ভাদ্রের পচা গুমসানো গরম। নিজের নিঃশ্বাসে ছাড়া হাওয়া নেই কোথাও। গাছের একটি পাতাও নড়াচড়া করছে না। অথচ আশ্চর্য! আঁশফল গাছের সরু লিক্‌লিকে একটি নিষ্পত্র কচি ডাল দুলছে। আরও আশ্চর্য! সেই ডাল আপনারই চোখের সামনে নিজেকে একটু একটু করে বাড়াচ্ছে। না, চোখের ভুল নয়। ভাল করে চোখ মুছে দেখুন স্থির নিঃস্পন্দ গাছে শুধু একটিমাত্র সরু ডাল দুলে দুলে দীর্ঘতর হচ্ছে।

সবুজ রং হলেও আসলে ওটা গাছের ডাল নয়, লাউডগা

সাপ। খাবার দেখেছে কোথাও, দুলতে দুলতে তাই এ-ডাল ডেকে ও-ডালে যাচ্ছে।

লী-অ। লী-অ। লী-অ।

পুকুরের ওপার থেকে আসছে কিসের একটা হল্লা।

লী-অ। লী-অ। লী-অ।

ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল পাড়ার একপাল কুকুর। হুড়-মুড়িয়ে ছুটে আসছে ছোট ছোট ছেলেদের একটা দঙ্গল। দলের যে পাণ্ডা, তার হাতে একটা বেঢপ ধনুক। পেছনে পেছনে তার কচি কচি গলায় হুংকার উঠছে। প্রকাণ্ড উঁচু বাদাম গাছটার একটা ডাল মড়মড় করে মাটিতে ভেঙে পড়ল। সেইসঙ্গে শানের মেঝেতে বাটি উপুড় করে ঘষ্‌লে যেরকম শব্দ হয়, তেমনি একটা বিকট কিচ্‌ কিচ্‌ শব্দে গাঁয়ের আকাশটা ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। দুপ্‌-দাপ শব্দে বাঁশবাগান তোলপাড় করে বাচ্চা বুকে নিয়ে মুখপোড়া হনুমানগুলো পালাচ্ছে। যাবার সময় বজবজ মিলের পয়লা নম্বরের হারামী লাইন-সাহেবের দু-পাটি বাঁধানো দাঁতের মত দাঁত-গুলো তারা দেখিয়ে যায়।

তারপর খানিকক্ষণ গ্রাম নিস্তব্ধ। রাস্তা ফাঁকা। পাড়ার বাচ্চারা গেছে পুলের পাশে সরু নালায় মাছ ধরতে। যত না মাছ ধরে, জায়গা নিয়ে তার চেয়ে বেশী চুলোচুলি করে। যে হারে, সে দূর থেকে বড় বড় ইঁট ছুঁড়ে জল নাড়িয়ে দিয়ে ছুটে পালায়।

যে-কোনদিন ঠিক এমনি সময় কান একটু খাড়া করে থাকলে শুনতে পাবেন উত্তর কিংবা দক্ষিণে, পুব কিংবা পশ্চিমে কেউ না কেউ কাঁদছে। হয় কাছেপিঠে কোথাও, নয় একটু দূরে। টেনে টেনে গাওয়া করুণ গানের মত কান্না। বেশির ভাগ দিন কাঁদে আজিজুলের মা। গাঁয়ের সেরা ছেলে ছিল আজিজুল। সব

কাজে সকলের আগে। মহরমের সময় তার লাঠি খেলা দেখে লোকের তাক লেগে যেত। তেমনি ছিল দশাসই চেহারা। নতুন বিয়ে করেছিল বেচারা। বেঁচে থাকলে কত কী হত সে। জোয়ান বয়সেই হত হয়ত আঠারো টাকা হপ্তায় তাঁত ঘরের লাইন সর্দার। কোমরের নিচে গোটা গা ঘা হয়ে বেচারা মরল।

ঘরে ঘরে আছে কাঁদবার অনেক লোক। কেউ কাঁদবে বহু-দিন আগে মরে যাওয়া বাপভায়ের জন্যে, কেউ বা স্বামীপুত্রের জন্যে কাঁদবে। হাতের সমস্ত কাজ সেরেসুরে দাওয়ার ওপর পা ছড়িয়ে তারা কাঁদতে বসবে। প্রতিদিনের আর পাঁচটা কাজের মতই প্রিয়জনদের কথা মনে করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদাও একটা পবিত্র কর্তব্য। নওসেরকে ভাত খাইয়ে কাজে পাঠিয়ে দশ বছর আগে আকালের সময় হাত-পা ফুলে মরে যাওয়া কোলের ছেলেটার জন্যে নওসেরের মা কাঁদে। যাদের শোক পুরনো তারা একা একা কাঁদে। যাদের নতুন, দলে দলে পাড়ার বৌ-ঝিরা এসে তাদের গলায় গলা মেলায়।

কান্নার মধ্যে থাকে এক সুদীর্ঘ কথাচিত্র। একটি মানুষের গোটা জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। কেমন দেখতে ছিল সে? কবে কী বলেছিল? কী সে ভালবাসত? বিষণ্ণ সুরে টেনে টেনে সেই সব বিবরণ দেয়, যে কাঁদে। কখনও কখনও অসম ছন্দে শুধু আবৃত্তি। তারপর আবার কান্না। যখন সদ্য বিয়োগের শোকে তারা সমবেতকণ্ঠে কাঁদে, তখন মৃত মানুষটির জীবনের এযাবৎ অজ্ঞাত অসংখ্য দিক উন্মোচিত হয়। যে তাকে চেনে না, জানে না—তার কাছেও লোকটি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটা মৃত্যুর জন্যে তারা জবাবদিহি চায়। কিন্তু চায় অদৃষ্টের কাছ থেকে।

অথচ এখানকার কোন মৃত্যুই খুব স্বাভাবিক নয়। শরীরে পুষ্টি না পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মৃত্যু। তেরো টাকা হপ্তায় টাকায়

দু-আনা সুদ গুণে গুণে মৃত্যু। কোথাও কাজ না পেয়ে নিরুপায় দুটো হাত মাটিতে ঠেকিয়ে ঘরে বসে তিলে তিলে মৃত্যু। শুধু তারা এমনভাবে মরে, যাতে জন্ম-মৃত্যুর সরকারী খাতায় রোগের একটা নাম লেখা যেতে পারে।

কেউ কেউ আছে, যারা চেঁচিয়ে কাঁদে না। চোখ দেখলেও বোঝা যাবে না তারা কাঁদছে। তাদের কেউ মরেনি, মরলে চেঁচিয়ে কাঁদত। প্রিয়জনদের তারা হারিয়েছে। আমিনার মাথায় মিছি-মিছি কলঙ্কের ডালি চাপিয়ে, মেরে ধরে বাপের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে তারই অর্থবান দুশ্চরিত্র স্বামী। স্বামী-সোহাগিনী হয়েও ফতিমার ঘর ভেঙেছে—অভাবের সংসারে আকণ্ঠ ঋণ করে যখন বাঁচবার আর কোন উপায় দেখেনি তার স্বামী, স্ত্রী-পুত্র ফেলে যেদিকে দু-চোখ যায় পালিয়েছে। লোকটা যদি গলায় দড়ি দিয়ে মরত, তবু মেয়েটা ডাক ছেড়ে কাঁদতে পারত। আট বছরের ছেলেটা এখনও বাপজান-বাপজান করে পাঁচ বছর ব্যবধানের একটা দূরতম ক্ষীণ আশা জাগিয়ে রাখে।

গোলাপজান অত শত বোঝে না। বছর চারেক তার বয়স। পিলেয় পেটটা মোটা। কানের দুটো ছ্যাঁদায় ঝাঁটার কাঠি গোঁজা। দুটো হাতে শুধু দায়মালকাটা দুটো বাতানা। বাপের আদুরে মেয়ে ছিল গোলাপজান। এক বছর আগে সাপের কামড়ে বাপ তার মরে গেছে মেদিনীপুরের কোন গাঁয়ে। মা আবার নিকে করেছে। নতুন বাপ গোলাপজানকে নেয়নি। নানীর কাছে এসে আছে। বেড়ার পাশে বসে আপনাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে ছড়া বলবে—ছবিওয়ালা একটা ছেঁড়া বইয়ের পাতা দেখে নিজের মনে বানানো অর্থহীন ছড়া। আর সেই ছড়ায় অনিবার্যভাবে থাকবে নতুন বরকনে, বিয়ে আর শ্বশুরবাড়ির বর্ণনা।

পাড়ার যখন সবাই চুপচাপ, পুকুরের ধারের রাস্তায় ইলেকট্রিক বাতির থামে ঠেস দিয়ে যখন জমিলার বুড়ো বাপ একবুক শাদা দাড়ি নিয়ে একঠেঙে হয়ে দাঁড়িয়ে একা একা নিঃশব্দে সুতোয় পাক দেবে, তখন বাঁশবনের রাস্তায় তরজার সুরে গেয়ে উঠবে এ-পাড়ার সব চেয়ে ডানপিটে ছেলে ইমানী—

মোজো খোঁড়া তরজাওলা গান গাইতে যাবে
পাঁপড়কে দেখে বলে হাওয়া খাওয়ার পাখা
জিলিপিকে দেখে বলে গোরুর গাড়ির চাকা
বাঁশবাগানকে দেখে বলে এ যে বড় বৃন্দাবন—

তারপর যা বলে তা সভ্য সমাজের পাতে দেওয়া যায় না।

ইমানীর পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখুন এখনও কালশিটের দাগ। পাশের বাড়িতে হাঁড়ি থেকে চাল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল ক-দিন আগে। গাছের সঙ্গে লোহার শেকল দিয়ে হাত বেঁধে সারাদিন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল তাকে। সারা গায়ে কেটে কেটে বসেছিল সপাং সপাং করে মারা চামড়ার শক্ত বেল্ট্। ইমানীর বাপ ভালো চাষী। গেল বার পাট বুনে সর্বস্ব খুইয়ে চাষবাস ছেড়ে এবার সে বাড়ি বাড়ি মাথায় করে কয়লা ফেরি করছে। ইমানীর মা মারা যাবার পর ইমানীর বাপ আর বিয়েসাদি করেনি। সন্ধ্যেবেলায় গাঁজার কল্কেয় টান দিয়ে ইমানীর মাকে সে শুধু ভুলতে চেষ্টা করে।

গাঁয়ে একটি লোককে আজ দেখতে পাবেন না, ভোর হলে মাজাভাঙা খোঁড়া যে লোকটা হাতে খড়ম বেঁধে হামাগুড়ি দিয়ে চড়িয়ালের বাজারে যেতে কসাইখানা পেরিয়ে বাঁদিকে মসজিদটার সামনে ভিক্ষেয় বসত। ক-দিন আগে সে শিরদাঁড়া সোজা করে হাত-পা ছড়িয়ে কবরের নিচে গিয়ে শুয়েছে।

তার এক ছেলে আছে। হুবহু সাহেবদের ছেলের মত

দেখতে। যেমনি রং, তেমনি গড়ন। আকালের সময় যখন ছিটিয়ে বিটিয়ে গিয়েছিল এ গাঁয়ের ঘরসংসার, ময়লা-ডিপোর মাঠে যখন গোরাপল্টনদের ছাউনি পড়েছিল, সেই সময় কালো মা-র পেট থেকে পড়া ছেলে। সবাই বলে, খোদার মেহেরবানি ; খোঁড়ার কুদ্‌রতের কথা কেউ বলে না। কিন্তু ছেলেটাকে দেখলেই সকলের মনে পড়ে যায় লড়াইয়ের সময় ছাউনি-বসানো ময়লা-ডিপোয় তাদের সেই সোনা-ফলানো জমিগুলোর কথা— লড়াই মিটে যাবার পর বিনা খেসারতে যে জমিগুলোতে মার্কিন তেল-মালিকরা বড় বড় ট্যাঙ্ক বসিয়েছে।

জীবনের দাঁড়িপাল্লায় দুঃখের বোঝা এমনি করে ভারী হয়ে উঠছে দিন দিন। ডানপিটে ইমানী দাঁড়িপাল্লার কথা উঠলে একটা হেঁয়ালী বলে—

> সুলুক্ সুলতানের মা
> নাকে দড়ি, ট্যাঁকে ঘা
> —ঐটে আমাদের দেবে গা ?

শুধু ঐটে নয়, এ-গাঁয়ের আরো অনেক কিছু দরকার। যা চেয়ে পাওয়া যাবে না। ছিনিয়ে নিতে হবে।

বেলা গড়িয়ে যায়। তখন আবার অন্য কাহিনী।

বাবর আলির চোখের মত

বজবজ থানার দক্ষিণের এক গাঁয়ের শেখ বাবর আলি মণ্ডল হঠাৎ বদলে গিয়ে আমার কবিতার একটি উপমার ভিতসুদ্ধ এভাবে নাড়িয়ে দেবে আগে ভাবতে পারিনি।

কবিতাটা বেরিয়েছিল 'পরিচয়'-এর এক পুজো সংখ্যায়। নাম ছিল 'সালেমনের মা'। তাতে আমি পাগল বাবর আলির চোখের সঙ্গে এলোমেলো আকাশের তুলনা করেছিলাম।

পাগল বাবর আলি। কিন্তু এখন আর সে পাগল নয়। মাস দুই আগে কী করে জানি না হঠাৎ তার মাথার অসুখ ভালো হয়ে গেছে। কদিন আগে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই সে আমাদের ব্যঞ্জনহেড়িয়া গাঁয়ে তার শ্বশুরবাড়িতে এসেছিল। তার একমাত্র মেয়ে সালেমনকে দেখতে। পাগল হবার পর আরও দু'পাঁচবার এ গাঁয়ে সে এসেছে। প্রথম প্রথম বাপের কাছে ঘেঁষতে চাইত না সালেমন। খুব ভয়-ভয় করত। বাবর আলির কাঠি-কাঠি আঙুলের লম্বা লম্বা নখ দেখে তার মনে হত কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই বুঝি চোখ গেলে দেবে। তারপর আস্তে আস্তে সালেমনের ভয় ভেঙে গেল। সে দেখল তার একরাশ চুলের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নখগুলো ডুবিয়ে রাখা ছাড়া বাবর আলি আর কোন যন্ত্রণা তাকে দেয় না। এমন কি অনেকদিন না দেখলে বাবর আলির জন্যে তার মাঝে মাঝে কষ্টও হত।

একটা জিনিস শুধু সালেমনের সহ্য হত না কোনদিন—বাবর আলি একদিনও তার দিকে চোখ তুলে তাকায় না কেন ?

এবার ভাল হয়ে এসে এই প্রথম বাবর আলি তার মেয়েটার দিকে তাকাল। প্রথমে সালেমনের চোখ, তারপর সারা মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। যেন এই প্রথম সালেমনের সঙ্গে তার দেখা। কেউ একটা ঈদেও এ-পর্যন্ত আদর করে নতুন জামা দেয়নি সালেমনকে। বাপের হাতে তারই জন্যে আনা রংচঙে জামাটা দেখেও কিন্তু সালেমনের হাত বাড়িয়ে দেবার এতটুকু ইচ্ছে হল না। কাঠ হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল।

সেও বাবর আলিকে ঠিক চিনতে পারছে না। বাবর আলি চুল আঁচড়েছে বলে নয়, টায়ারের তৈরি জুতো পায়ে গলিয়েছে বলে নয়—আসলে চোখের চাউনিটা বদলে গিয়ে গোটা মানুষটাই একদম বদলে গেছে। লণ্ঠনের চিমনির মধ্যে যেমন আগুন স্থির

হয়ে থাকে, তেমনি স্থির হয়ে আছে বাবর আলির চোখের দুটো তারা।

সালেমনের মুখের প্রত্যেকটা ভাঁজে বাবর আলি খুঁজছিল দশ বছর আগে হারানো অন্য একটা মুখ। সে-মুখ সালেমনের মা গোলসানের।

বাবর আলির মাথা খারাপ হবার পর সালেমনকে কোলে নিয়ে পুরো একটা বছর অপেক্ষা করেছিল গোলসান। কিন্তু পরের বছরেও চালের দর পড়বার যখন কোন লক্ষণই আর দেখা গেল না, কারো কাছে হাত পাতবারও উপায় থাকল না—তখন এক রেস্তওলা আধবুড়োর গলায় গোলসানকে ঝুলে পড়তে হল। মার সেই নতুন সংসারে সালেমনের জায়গা হয়নি। কিন্তু তাতেও আপশোস ছিল না সালেমনের—যদি না দু'বছর যেতে না যেতে দেখত মার কোলে তার জায়গা জুড়ে বসেছে গোল গোল হাত নিয়ে ফুটফুটে একটা ছেলে। মার নতুন ময়না। নানীর কাছে আরও একবার তার মা এসেছিল কলকাতার চাটিবাটি উঠিয়ে নতুন স্বামীপুত্র নিয়ে বরাবরের মত পাকিস্তানে চলে যাবার আগে।

গাঁয়ে কিছুটা জমি বাবর আলির ছিল নিজের, কিছুটা ভাগে। মাথা ভাল হয়ে যাবার পরই প্রথম সে খোঁজ নিয়েছিল বউ নয়, জমিটুকুর। জমিটা তার পাগল অবস্থায় বেহাত করে নিয়েছে তার এক চাচাতো ভাই। প্রথমটা বাবর আলি মাথা গরম করে একটু চেঁচামেচি করেছিল, কিন্তু রেজিস্ট্রি আপিসের দলিলে নিজের হাতের টিপসই দেখার পর থেকে ও-সম্বন্ধে আর একটি কথাও সে বলেনি।

ঠিক কী জন্যে, তা সালেমন বলতে পারে না—তবে বাবর আলির চোখের স্থির দৃষ্টিটা তার ভালো লাগেনি। বাবর আলির

চোখের দিকে আগে আগে যখনই সে তাকিয়েছে, কোনদিন তার অস্বস্তি হয়নি। যেমন গাছের পাতার দিকে, জলের দিকে, আকাশের দিকে সে তাকাত, তেমনি অনায়াসে বাবর আলির চোখের দিকে সে তাকাতে পারত। এবারও ঠিক সেইভাবে তাকাতে গিয়ে সালেমন হঠাৎ খুব বিব্রত হয়ে পড়ল—বাবর আলি চোখ তুলে তাকিয়ে তাকে দেখছে।

বাপের দেওয়া তালপাতার ভেঁপুটাতে ফুঁ দিতে দিতে হঠাৎ একটা ঝুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে সালেমন তক্ষুনি একছুটে চলে যেতে পেরেছিল সাঁকোর ধারে রাস্তায় কুচো কুচো পোড়া কয়লা কুড়োতে —কেননা ঠিক সেই সময় মিউনিসিপ্যালিটির ঘ্যাঁষ্-ফেলার গাড়িটা গাঁয়ে ঢুকতেই পাড়া জুড়ে একসঙ্গে অনেকগুলো কচি গলায় হল্লা শোনা গিয়েছিল।

বাবর আলির চোখদুটো পাথরের হলে ওভাবে ছুটে পালাতে হত না সালেমনকে। বাবর আলির অতলস্পর্শ স্থির চোখে দশ বছর পর হারিয়ে-পাওয়া এক পৃথিবী তার সমস্ত কণ্টকিত স্মৃতি, বিপর্যস্ত বাসনা, উদ্বিগ্ন স্বপ্ন নিয়ে ভিড় করে ঝুঁকে দেখছিল। ছোট্ট ছেলে ডুবজলে যেতে যেমন ভয় পায়, তেমনি ভয় পেয়েছিল সালেমন।

বাবর আলি গাঁয়ে ফেরার পর শেষ যে খবর পেয়েছি, তা এই —ভাঙা ঠক্‌ঠকি তাঁতটাকে সারিয়ে-সুরিয়ে গামছা বুনে পেট চালাবার চেষ্টায় আছে বাবর আলি। সুখ আর দুঃখ, আনন্দ আর বেদনার মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড ফারাক আছে—বাবর আলির চোখে ক্রমেই তা ধরা পড়ছে। আর যতই সে বুঝতে পারছে, ততই একটা নিদারুণ রাগে তার হাতের মাংসপেশীগুলো ফুলে উঠছে। কবে কী কারণে তার মাথায় খুন চাপবে কিছু বলা যায় না। লোকে তাই তটস্থ হয়ে আছে।

সে যাই হোক, 'সালেমনের মা' কবিতাটা আমাকে বদলাতেই হবে। একটা সামান্য উপমা আমাকে এমন ফ্যাসাদে ফেলবে কে জানত ?

আজ আমি ভাবছি, শুধু 'সালেমনের মা' নয়, শুধু দুটো একটা উপমা নয়—আগাগোড়া অনেক কবিতাই আমাকে বদলাতে হবে।

চড়িয়ালের যে-রাস্তাটাকে আমি এতদিন দুশ্চিন্তায় কপাল কুঁচ্কে থাকতে দেখেছি, আজ তাকে দেখে মনে হয় হাত মুঠো করে সে যেন কী একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

আমাদের পাড়ায় যে লোকটা এক বছর আগে মাঝরাত্তিরে বাঁশবনে গলায় দড়ি দিতে গিয়ে বৌয়ের কান্না শুনে ফিরে এসেছিল, আমি জানি সে এখন ভাবছে তার ঘ্যান্-ঘ্যান্-করা রুগ্ন ছোট মেয়েটাকে এবার পুজোর সময় ডুরে-পাড় একটা শাড়ি কিনে দেবার জন্যে চটকলের মজুর হিসেবে বোনাস্ পাওয়া তার একান্ত দরকার।

ছুটির পর বজবজ মিলের বড় গেটে বোনাসের দরখাস্তে প্রথম দিন নিচু হয়ে সই নিতে নিতে হঠাৎ চম্‌কে উঠলাম একজনের আঙুল দেখে। একেবারে কাগজের মত শাদা। মুখের দিকে তাকালাম ঠিক তেমনি শাদা। শরীরের কোথাও একবিন্দু রক্তের একটু আভাস পর্যন্ত নেই। কাঁপা কাঁপা অক্ষরে সই দিয়ে ছেঁড়া ছাতা বগলে করে টলতে টলতে লোকটা বাড়ি পর্যন্ত পৌঁচেছিল কিনা আমি জানি না। তারপর আর কোনদিন গেটে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। রাস্তার মধ্যে সেদিন নিশ্চয় কোন অঘটন হয়নি। হলে কানে আসত। শেষবারের মত মুখ থুবড়ে পড়বার আগে এখনও নিশ্চয় কিছুদিন সে ছেঁড়া ক্যানভাসের জুতোটা পায়ে দিয়ে টলতে টলতে আসবে, টলতে টলতে যাবে।

লোকটার কথা মনে হলেই বরফের মত তার ঠাণ্ডা আঙুলগুলো আজও ছ্যাঁত্ করে এসে আমার হাতে লাগে।

আমার কবিতাগুলো যে বদলানো দরকার সেদিনও বুঝিনি। বুঝলাম পনেরো তারিখ সকালে।

ভোর ছটা থেকে অ্যাল্‌বিয়ন-লোথিয়ানের প্রকাণ্ড বন্ধ গেট্‌টার সামনে আমরা প্রশ্নচিহ্নের মত দাঁড়িয়ে। টিপ্ টিপ্ করে লোক এসে জমা হচ্ছে আর ভাবছে ঢুকবে কি ঢুকবে না। গেট ফাঁক করে চোখ নিচু করে ঢুকে যাচ্ছে দশ জনে একজন। বাকি সবাই ভোঁ বাজার জন্যে অপেক্ষা করছে। সবাই ঢুকলে তবে ঢুকবে। মনের উত্তেজনা চাপা দেবার জন্যে সবাই একটু পর পরই জায়গা বদলাচ্ছে। ফলে সেই ক্রমবর্ধমান জনতাকে একটা চলমান স্রোতের মত দেখাচ্ছে। ইস্কুলের হরতালী মেয়েরা এসে লাইন দিল গেটের সামনে। মজুরদের একটা দল ছিট্‌কে ঢুকে গেল ভেতরে। খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা একজন মজুর গেটের কাছে গিয়ে কী ভেবে হঠাৎ দুপা পিছিয়ে এসে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল—চলো ভাই, ফিরে চলো। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা হাত শূন্যে ছুঁড়ে কয়েকজন তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল কেউ যাবে না, কেউ যাবে না। এমন সময় ভোঁ বাজার সঙ্গে সঙ্গে হাট হয়ে গেট খুলে গেল। তারপর নিঃশব্দ একটা মুহূর্ত, বিরাট জনস্রোত একবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে পিছিয়ে গেল। খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা অচেনা সেই লোকটা ভিড়ের মধ্যে হাত তুলে নাচতে নাচতে চেঁচিয়ে উঠল—ফিরে চলো, ফিরে চলো।

কাজে-না-যাওয়া লোকগুলো তারপর কোথায় সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সাড়ে সাতটায় যে-মিছিলটা কেঠোপুলের দিক দিয়ে ঘুরে বজবজ মিলের দুটো গেটে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে সেই খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা লোকটা ছিল।

অনেকদিন পর দুপুরবেলায় তাকে একদিন দেখলাম চড়িয়াল বাজারে। লাইনছুটি পেয়েছে সে। দোকান থেকে নারকোলের দড়ি কিনছে ঘরের চাল বাঁধার জন্যে। ঘোরতর সংসারী লোক। হরতালের দিন সকালে আগুনের শিখার মত তার যে-মূর্তি দেখেছিলাম লোকটার আটপৌরে চেহারার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। তার চোখদুটো নিকোনো মাটির দাওয়ার মত শান্ত। বোনাসের কথাটা বলতেই মুখটা ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ একবার বিদ্যুৎ খেলে গেল তার চোখে। তারপর যখন আবার ফিরে তাকাল, দেখলাম নিকোনো মাটির দাওয়ার মত তার চোখদুটো শান্ত।

সেদিনকার সেই সাড়ে সাতটার মিছিলে খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা লোকটা ছিল না বটে, কিন্তু বাওয়ালির রাস্তাটা পেরিয়ে মিছিলে এসে জুটে গেল আরও কিছু লোক। তার মধ্যে ছিল বাঁ-হাতের কব্জি-ভাঙা সেই লোকটা—বাজারে চায়ের দোকানে যে-লোকটা একহাতে চা দেয়। পঁচিশ বছর আগেও বজবজ মিলে কাজ করত সে। মেশিনে হাত জড়িয়ে গিয়ে কব্জির হাড়টা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে যাবার পর থেকে আর সে চটকলের কেউ নয়, কিন্তু চটকলে কিছু একটা হলেই সে উস্‌খুস্‌ করে। তখন নাকি ক্ষতি-পূরণের আইন ছিল না। নইলে আজকালকার দিন হলে কোর্ট-কাছারি করে বাঁ-হাতের ভাঙা-কব্জির জোরে সে সাহেবদের হাত মুচ্‌ড়ে অন্তত কিছু টাকা আদায় করে ছাড়ত। মিছিলে দাঁড়িয়েই তার মনে পড়ে যায় সেই যুগটার কথা, যে-যুগে মিছিল-টিছিল ছিল না। কিন্তু লোকের রাগ ছিল। সেই লাইন-সাহেবটার কী যেন ভালো নাম? সেই বেঁটেখাটো হারামজাদা সাহেবটা, যে একজন ছোকরা পিন্‌বয়কে লাথি মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল আর উঠতে বসতে বাপ-মা তুলে কুৎসিত গাল দিত! একদিন পেছন থেকে

সাহেবের মাথায় আচমকা চটের বস্তা গলিয়ে দিয়ে মুখ বেঁধে তারপর নলী দিয়ে সবাই মিলে কী মার কী মার। তারপর আর সেই লাইন-সাহেবকে বজবজ মিলে কেউ দেখেনি। বড়সাহেব নাকি পরের জাহাজেই তাকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল।

চায়ের দোকানের সেই লোকটা মিছিলের লোকগুলোর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে ভাবে—তার না হয় একটা হাত নেই, কিন্তু ছুটো হাত থেকেও চটকলের লোকগুলো আজকাল সাহেবদের পিটিয়ে লাশ করে না কেন?

কিন্তু ন তারিখের মিছিলের কাছে পনেরো তারিখের মিছিলটা এতটুকু হয়ে গেল। উত্তর আর দক্ষিণ থেকে হাতে হাতে লাল কাগজের নিশান উড়িয়ে আসছিল চিত্রিগঞ্জ আর বিড়লাপুরের যে ছুটো বিরাট মিছিল, তাদের ছুটো মুখ যখন একই সঙ্গে কয়লা সড়কের মোড়ে এসে পোঁছুল তখন আর পাশের মাঠটায় তিল ধারণের জায়গা নেই। সারা দিন বৃষ্টির পরও আকাশ ঝাম্‌রে আছে, তবু লোকের কামাই নেই।

সকালে বিড়লাপুরে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে শুনে এসেছিলাম সকালের শিপ্টের একদল মজুর কারখানার মালিকের সঙ্গে ভগবান ও আল্লারূপী ঈশ্বরকে পৃথক পৃথক ভাবে জড়িয়ে মুখে-আনা-যায় না এমন খিস্তি করছে। বিকেলে কয়েক ঘণ্টার জন্যে বৃষ্টি ছেড়ে যাবার পর আমার জানতে ইচ্ছে করছিল সেই লোকগুলো জিভ কেটেছে কিনা।

এত লোক নিয়ে ঐটুকু জায়গায় সুস্থিরভাবে সেদিন সভা হতে পারেনি, কিন্তু যাবার আগে বোনাসের ব্যাজ-আঁটা বুক টান করে হাত তুলে সবাই জানিয়ে দিয়ে গেল—হাত পেতে নয়, হাত মুচড়ে নেবার জন্যে তারা তৈরি।

একটা গোটা তল্লাট ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়াচ্ছে চোখের ওপর

দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তার পুরো ছবিটা আমার কাছে এখনও স্পষ্ট নয়।

চটকলের গেট থেকে বেরিয়েই যে-লোকগুলোকে এতদিন হাঁফ-ধরা গলায় বলতে শুনেছি—শালারা আর বাঁচতে দেবে না—তারাই আজকাল গলায় ঝাঁঝ দিয়ে বলছে—দাও শালাদের ঠাণ্ডা করে।

হপ্তাবাজারে মিটিং হয় টিফিনের সময়। লালঝাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়ে লোকে হাঁ করে শোনে তাদের সেই নেতার বক্তৃতা, ক'বছর আগে ছাঁটাই হয়ে জেলে যাবার আগে পর্যন্ত যে তাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে বজবজ মিলে তাঁত চালিয়েছে আর এখন যে ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে মন্ত্রীদের মুখের ওপর ধুড়ধুড়ি ধুইয়ে দিতে একটু ভয় পায় না।

তারা শোনে লালঝাণ্ডার সেই রোগা টিংটিঙে নেতার কথা, ভদ্দরলোকের ছেলে হয়েও যে মজুরদের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। শোনে আর তারা অবাক হয় হাড়-বার করা ঐটুকু বুকের মধ্যে ফুস্‌ফুস্‌টায় এত জোরও আছে?

হপ্তাবাজারে মিটিং চলতে চলতে বুড়ো হারানদা আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে বলেন, এবার জম্‌বে।

বেশ বুঝতে পারছি ভালো করে জমে ওঠার আগেই আমার কবিতাগুলো বদলে ফেলা দরকার।

বজবজের মাথায় যে-আকাশটাকে দেখছি তার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে হঠাৎ কেন যেন বাবর আলির চোখের কথাই ফের মনে পড়ল। পাগল বাবর আলি নয়। যে-বাবর আলি ঠক্‌ঠকি তাঁতের সামনে বসে সারা রাত জেগে জীবনের সঙ্গে শেষবারের মত বোঝাপড়া করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে, একমাত্র তার চোখের সঙ্গেই এই গন্‌গনে আকাশটার তুলনা করা চলে।

সেই আকাশের নিচে লড়াই এবার জমবে।

খবরের খোঁজে

কলকাতা থেকে দেড় ছ'ঘণ্টা। কাঁচড়াপাড়া থেকে দেড় ক্রোশ। যুদ্ধের তখন পুরো মরশুম। ইষ্টিশানে ইষ্টিশানে লাইনবন্দী মালগাড়ির বুকে গা দিয়ে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে আছে কলের কামান আর সাঁজোয়া গাড়ি। মুখ তাদের ফেরানো ইম্ফল আর কোহিমা, বুথিডং আর লেডো রোডের দিকে।

তখনও পঞ্চাশের লাশ রাস্তার রাস্তায় গড়ায় নি। কাঁচড়াপাড়ায় তৈরি হবে আজব শহুর ওয়া-

শিংটন। মাথাকাটা তালগাছের মত ঝোপেঝাড়ে উঁকি দিচ্ছে বিমানবিধ্বংসী কামানের মুখগুলো। সারি সারি তাঁবু পড়েছে মাঠে-ময়দানে। রাক্ষুসে ট্রাকের পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে। ঘাসের মধ্যে মুখ গুঁজে আছে রাশীকৃত খালি সিগারেটের প্যাকেট। চলতে চলতে পা সেঁটে যায় চুইং গামের আঠায়। সূর্য ডুবলেই নরক গুলজার। গৃহস্থের দরোজায় দরোজায় হানা দেবে দিগ্বিজয়ী মার্কিনী সভ্যতা।

শহর উঠবে। তাই গাঁ উজাড় করছে মার্কিন গোরা পল্টনের দল। মাঠের মধ্যে লৌহদানবের মত দাঁড়িয়ে আছে বুলডোজার আর ক্যাটারপিলার। চোখের নিমেষে তৈরি হচ্ছে শানবাঁধানো রাস্তা। এক গোঁত্তায় ভেঙে পড়ছে বড় বড় মহীরুহ।

যাচ্ছিলাম বিষ্ণুপুর গ্রামে। খবরের খোঁজে। দেখেই রাস্তার মধ্যে ছেঁকে ধরল একগাদা লোক। হাতে জরিপের ফিতে নেই, তবু ভেবেছে আমিন। অনাথা বিধবার দল কেঁদে পড়ল, 'পথের ভিখিরি করিস্‌নে, বাবা।' বলতে বলতে আঁচলের খুঁট থেকে খুলে দেখায় পোকায় খাওয়া ছেঁড়া উলিডুলি দলিল-পাট্টা।

তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা এক বুড়ি ঠাকুরঘরে ভাঙা কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো সিঁদুর-লেপা অস্পষ্ট ছবির সামনে মাথা ঠোকেন। সাত পুরুষের অসংখ্য স্মৃতি জড়ানো এই ভিটে ধুলোয় মিশে যাবে, প্রাণ থাকতে কেমন ক'রে সহ্য হয়? হে করুণাময়, তোমার কি চোখ নেই?

নোটিশ এসেছে অনেকদিন। এ গাঁয়ে যাদের দু'এক পুরুষের বাস তারাও উঠি উঠি ক'রে উঠতে পারছে না। ঘরবাড়ি, বাগান, ক্ষেতখামার সব কিছুর জন্যেই খেসারত পাওয়া যাবে। পাওনা ঠিক করবে সরকারী আমলার দল নিজেদের খুশিমাফিক। তাদের খুশি করতে মোটা টাকা খসাতে হবে। গাঁয়ে

যাদের অবস্থা ভাল, তাদের বেলায় জরিপের ফিতে তাই লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে।

কিন্তু তার চেয়েও সাংঘাতিক মিলিটারির মেজাজ। হঠাৎ ঘোঁৎ ঘোৎ করতে করতে একদিন ভোরবেলায় গ্রামের মধ্যে হানা দিল বুলডোজার। তার মধ্যে বসে আছে একটিমাত্র লালমুখ। গাঁ-সুদ্ধ লোক অবাক। লোকলস্কর কই? সেপাই-বরকন্দাজ কই?

যার বাড়ির দেওয়াল প্রথম ভেঙে পড়ল, সে লোকটা কোথায় দুঃখে পাগল হয়ে যাবে, তা নয় সে চোখ কপালে তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ একটি বুলডোজারের কাণ্ডকারখানা দেখছে। এক ঘণ্টার মধ্যে সব সাফ হয়ে গিয়ে যখন গাঁয়ের মধ্যে ফাঁকা মাঠ এগিয়ে এল, তখন হুঁশ হল লোকটার। কপাল চাপড়ে কান্না শুরু হয়ে গেল তার। আশ্চর্য কল বানিয়েছে সাহেবরা। কিন্তু কী নিষ্ঠুর!

আর দেরি করা চলে না। তাই চাটি বাটি উঠিয়ে গাঁয়ের লোক ছেলেবউ সঙ্গে নিয়ে যেদিকে দুচোখ যায় একে একে চলে যেতে শুরু করল।

বাংলাদেশের বুক থেকে এমনি করে সেদিন মুছে গেল একটি গ্রাম, পুরো একটি পরগণা।

যুদ্ধের মরশুমে বাংলার গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে এমনি কাটা-ছেঁড়া অসংখ্য জীবনচিত্র চোখে পড়ত।

আমি ছিলাম কাগজের রিপোর্টার। তাতে সুবিধে অসুবিধে দুই ছিল। সাধারণভাবে ঘুরতে গেলে লোকের সঙ্গে আলাপের সূত্র ঠিক করাই কঠিন হয়ে পড়ে। একজন উটকো লোকের কাছে গ্রাম-পঞ্চায়তের কথা, নিজেদের ঘরসংসারের কথা বলতে বাধে। কিন্তু একটা উপলক্ষ থাকলে মন জানা কিছুটা সহজ হয়।

‘শুনলাম এখানে নাকি না খেয়ে লোক মরছে?’

প্রশ্নটা প্রথম চোটে গ্রামের লোকদের চটিয়ে দেয়। যেন গ্রামের নামে কলঙ্ক রটানো।

‘সে খোঁজে কী দরকার আপনার?’

নিজেকে সামলে নিতে হয়। একে শহুরে লোক দেখলেই গ্রামে একটু অবিশ্বাসের ভাব জাগে। শহরে থাকে জমিদারের নায়েব গোমস্তা, ফন্দিবাজ উকিলমুহুরী, সুদখোর মহাজন আর ঘুষখোর কেরানীবাবুর দল—যত সব ফিচেল লোক।

গ্রামের লোক শহরে এসে যেমন হকচকিয়ে যায়, শহর থেকে গ্রামে গেলেও কতকটা সেই অবস্থা হয়। একরত্তি বাঁশের পুল পেরোতে গিয়ে যখন শহুরে লোকের পা কাঁপতে থাকে, ইস্ত্রিকরা লোটানো ধুতিতে যখন কাদা ছিটকে লাগে, তখন গ্রামের লোক মুখ টিপে না হেসে পারে না।

‘বাবু’ কথাটা কখন শুধু সম্বোধন আর কখন তাতে বিদ্রূপ মেশানো—তা ঠাহর করা অনেক সময় মুস্কিল হয়ে পড়ে। নোয়াখালির গ্রামে হঠাৎ যখন পেছন থেকে ‘ও ভদ্দরলোক’ ব’লে ডাক শুনলাম, তখন প্রথমটা নাক কান লাল হয়ে উঠেছিল। পরে বুঝলাম বিদ্রূপ নয়, সম্বোধন মাত্র।

বিশ্বাস অর্জন করতে না পারলে গ্রামের লোকের মুখ খোলানো খুব শক্ত। বাইরে থেকে যারা গ্রামে যায়, তারা বেশির ভাগই সরকারী লোক। বাদবাকিদের মধ্যেও অধিকাংশই যায় লোক ঠকাতে। এক কালে রিলিফের বাবুদের কিছুটা পশার ছিল, আজকাল ঢুঁ ঢুঁ।

কিন্তু গত দশ-বারো বছরে বাংলার গ্রামাঞ্চলে একদল নতুন মানুষের আনাগোনা শুরু হয়েছে। তারা খাজনার তাগাদায় যায় না, এমন কি রিলিফের চালচিঁড়ে বেঁধেও যায় না। তারা একদম

নতুন কথা বলে। তারা বলে, 'গতর যার জমি তার।' হাত পাতার কথা তারা বলেই না, তারা বলে লড়াই করার কথা। উটকো হলেও এই লোকগুলোকে গাঁয়ের মানুষ ভালবাসে, বিশ্বাস করে, তাদের কাছে মনের কথা নিঃসঙ্কোচে খুলে বলে।

গ্রামে সব কিছু এদের নখদর্পণে। প্রত্যেকটি গ্রামবাসীর হাঁড়ির খবর তারা রাখে। সুখেদুঃখে বিপদে আপদে পাশে দাঁড়ায় বলেই এরা গ্রামবাসীর এত আপনজন।

এই আপনজনদের ধরতে না পারলে গ্রামের আসল খবর পাওয়া যায় না।

মৈমনসিংহের হালুয়াঘাটে আলাপ হয়েছিল এমনি একজনের সঙ্গে। চোখে চশমা। ছিপ্ছিপে বুদ্ধিজীবীর চেহারা। কবি কিংবা অধ্যাপক হ'লে বেশ মানাত। বাঁধানো দাঁত বয়সের নয়, বৃটিশ শাসকদের সবুট অত্যাচারের সাক্ষ্য বহন করছে। কথা বলেন ধীরস্থির ভাবে। দেখে মনে হবে নেহাৎ শান্তশিষ্ট মানুষটি।

বাজারের মধ্যে ছোট্ট একটা ঘর। শোওয়া ছাড়া আর কোন কাজে লাগে ব'লে মনে হয় না।

অন্য কোন জেলায় তাঁর বাড়ি। বাড়িঘর থেকেও নেই। কিন্তু জীবনে রুক্ষতার কিছুমাত্র ছোঁয়াচ আছে ব'লে মনে হয় না।

ডুমনাকুড়া, ভুবনকুড়ার গোটা অঞ্চল ঘুরেছি তাঁর সঙ্গে। অন্তঃপুরে তাঁর অবাধ প্রবেশ। গোটা তল্লাটে অচেনা কেউ নেই—ডালু, কোচ, মার্গান সবাই ভালবাসে। একটু কিছু মুখে না দিলে রাগ করে।

সে ভালবাসা যে অপাত্রে নয়, তার প্রমাণ তারা বহুবার বহু রকমে পেয়েছে। শুধু দুর্ভিক্ষের ধর্মগোলায় নয়, জমিদারের লাঠিয়াল আর পুলিশ-পল্টনের সঙ্গে সামনাসামনি সংগ্রামে।

আজ আর হালুয়াঘাট বন্দরের সেই ছোট্ট ঘরে লোকটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। হয়ত পাওয়া যাবে গারোপাহাড়ের বনে-জঙ্গলে তাকে। বুনো হাতীর পালের চেয়েও হিংস্র সরকারী সশস্ত্র পল্টন গারোপাহাড়ের নিচের সেই আদিগন্ত হিরণ্ময় ধানক্ষেত পুড়িয়ে দিয়েছে, রক্তের সমুদ্র বইয়ে দিয়েছে নৃশংস সঙীনের মুখে। তার বিরুদ্ধে হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে ডুমনাকুড়া-ভুবনকুড়ার মানুষ। সে সংগ্রামে দলের আগে থেকেছে হালুয়াঘাট বন্দরের ছোট্ট ঘরটুকুর সেই শান্তশিষ্ট মানুষটি। তার কবি-কবি মুখে আজ দাউ দাউ করে আগুনের শিখা জ্বলছে কিনা কে জানে। কিংবা সেই স্নিগ্ধ মুখ হয়ত আগুনের এত আঁচেও ঠিক তেমনি আছে।

একা গেলে কী মুস্কিল, তা টের পেয়েছিলাম মহিষাদলের গ্রামে।

পেছনে ফেলে এসেছি কঙ্কালের খাল। তার দুটো পাশ চিক্ চিক্ করছে রোদ্দুরে। লাইনবন্দী হয়ে পড়ে আছে মানুষের হাড় আর মাথার খুলি। দুর্ভিক্ষে শুরু; মড়ক আর মহামারীতে বয়ে চলেছে মৃত্যুর সেই একটানা স্রোত।

একটু ভেতরে ঢুকে এঁদো পুকুরের পাশে খড়ো ঘর। মাথার চাঁদি ফাটানো দুপুরের রোদ। তেষ্টায় বুক পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। যদি একটু জল পাওয়া যায়। আসার সময় কলেরা টাইফয়েডের ইঞ্জেকশন নিয়ে এসেছি। কাজেই মৃত্যুর ভয় নেই।

কাছে এসে দেখলাম পুকুরটার জল পচে কালো হয়ে আছে। দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না।

তাকাতেই একজন আধবুড়ো লোক বেরিয়ে এলো। চেহারা দেখেই তার মেজাজ খিটখিটে বলে মনে হল।

'একটু জল।'

'শহরের লোক বুঝি! লোক মরা দেখতে এসেছেন?'

উত্তর দেবার আগেই সে এঁদো পুকুরটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'খেতে হবে ঐ জল। আমরাও খাই।'

প্রশ্ন নয়, জিজ্ঞাসা নয়—একেবারে সটান অগ্নিপরীক্ষায় ঠেলে দেওয়া। অগত্যা চোখ বুঁজে সেই জলই খেতে হ'ল। গরম ভাতে-ভাত না খাইয়ে শেষ পর্যন্ত কিন্তু কিছুতেই ছাড়ল না। খেতে ব'সে তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না কাগজে খবর ছাপিয়ে কী লাভ। ঘাড় নেড়ে সে বলল, হ্যাঁ তাতে অবিশ্যি কাগজের কাট্‌তি হয়।

তখন নিজেকে এত অসহায় বলে মনে হয়।

মনে পড়ে যায় জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের বালিয়াড়িতে শুয়ে কাটানো এক বিনিদ্র রাত্রির কথা। মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝাপটায় নাকে-মুখে বালি এসে লাগছে। চোখদুটো একটু ফাঁক করে মুড়ি দিয়ে শুয়েছি।

একটু দূরে ইস্টিশানের বাজার। গোটা দুই পাইস্ হোটেল আর পান বিড়ির দোকান। রাস্তার খানিকটা পর্যন্ত তার আলো এসে পড়েছে। রাত একটু নিশুতি হতেই তাকিয়ে দেখি সেই আবছা আলোয় দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি শিশু আর নারী মূর্তি। তারা যে যাত্রী নয়, সে কথা পরে জানলাম।

একটু পরেই কিছুটা দূরে জন দুই গোরাপল্টনের আবির্ভাব হল। দুটি ছোট ছেলে নারীমূর্তির দঙ্গল থেকে এগিয়ে এল। গোরাপল্টন দুটি তাদের অনুসরণ করে পাশের ফাঁকা মাঠের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আস্তে আস্তে ছেলে দুটি ফিরে এল। তারপর সেই একই অন্ধকার মাঠের দিকে আবার তারা রওনা

হল। এবার তাদের অনুসরণ করল দুটি নারীমূর্তি। তারপর বারম্বার একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি।

কারো পক্ষে সে রাত্তিরে চোখের পাতা এক করা অসম্ভব। চোখ দুটো জ্বলে যাচ্ছে। রাগে নিস্‌পিস্‌ করছে দুটো হাত। ছুটে গিয়ে টিপে ধরব শাদা শয়তানদের কণ্ঠনালী ?

জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের বালিয়াড়িতে অসহায় যন্ত্রণায় একা ছট্‌ফট্‌ করলাম সেদিন সারাটা রাত।

দূরে দাঁড়িয়ে দেখা।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সেদিন চব্বিশ পরগণার গ্রামবাসীর পুনর্বাসনের দাবিতে বিরাট এক জমায়েতে সভার একধারে দাঁড়িয়ে ডায়মণ্ডহারবারের গ্রাম থেকে আসা ষাট বছরের এক বুড়ির সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল।

'কে আছে বাড়িতে ?

'এইটুকুন এক নাতনী আর একটা গাইগরু।'

কতক্ষণ কথা হয়েছিল জানি না। বুড়ি আমাকে আর বলতে দেয়নি। একা সে ব'লে চলেছিল। আমি শুনছিলাম মন্ত্রমুগ্ধের মত। বুড়ি একটি কথায় এসে থেমে গেল। আস্তে আস্তে কথাগুলো উচ্চারণ ক'রে বলল, 'ভগবান নেই'। এ নাকি তার দুঃখে-পোড়া গোটা জীবনের উপলব্ধি। জীবনের আগাগোড়া ইতিহাস সে উন্মুক্ত করে ধরেছিল আমার কাছে।

আমি সেদিন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত শুনেছিলাম। তার একটি কথাও আজ আর আমার মনে নেই। দুর্বল স্মৃতির জন্যে নয়, কারো পক্ষেই তা মনে রাখা অসম্ভব। সাধারণ ভাষা নয়, সাধারণ উপমা নয়। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতার ভাষায় সেদিন

ডায়মণ্ডহারবারের এক গ্রাম্য বুড়ি ওয়েলিংটন স্কোয়ারের জনসভার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলেছিল।

ষাটটি বছরের যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনের সেই মহামূল্য খবর জেনেও আজ পর্যন্ত কাউকে জানাতে পারিনি। সাধারণ মানুষের তাপদগ্ধ জীবন, সেই জীবন থেকে উৎসারিত তার ভাষার মহা-সম্পদ থেকে আমরা যারা বঞ্চিত—তাদের এ নিষ্ফলতা অনিবার্য। হয়ত অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জন-সাধারণের সঙ্গে মিশে যেতে পারলে তবেই পৃথিবীকে আগামী দিনের খবর দেওয়া সম্ভব।

একুশের সুরে বাঁধা

১৯৫২।

"২১শে ফেব্রুয়ারি।

সারা শহরটা থমথমে। দোকানপাট কিছু খোলা কিছু বন্ধ। ছাত্ররা জড়ো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে। রাস্তায় পুলিশ ট্রাকভর্তি। রোদ তেতে উঠেছে মাথার ওপরে। কপালের দুধারে রগ করছে দপ্‌দপ্‌। মুখগুলো সবাইর উত্তেজনায় চকচকে। চোয়ালগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে। চোখে-মুখে ঠিকরে পড়েছে প্রশ্নের চিহ্ন। সবাই জানতে চায় কী হবে, কী করবে এখন।

একশো চুয়াল্লিশ ধারা সরকার জারি করছে। এখন মিছিল করা মানেই একশো চুয়াল্লিশ ভাঙা। তাতে আমাদের লাভ হবে না, গণ্ডগোলের সম্ভাবনাই বেশি—

সবাই খেপে উঠেছে শুনে।

বিশ্বাসঘাতক! আমরা ফিরবো না।…

…মিছিলের একপাশে দাঁড়িয়ে ভেবেছি কী করব। আমিও কি এ মিছিলে শরিক হবো? যদি কিছু হয়?…কী করে কখন চিন্তার সমাধান করে টিয়ারগ্যাস থেকে বাঁচবার জন্যে আর সবার সঙ্গে পুকুর থেকে রুমাল ভিজিয়েছি টের পাইনি। যখন টের পেলাম, দেখি গেটের সামনে পুলিশ-ব্যারিকেড ভাঙার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি আর অন্যের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আওয়াজ তুলছি: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই—

…শুরু হল টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ার পালা। লং রেঞ্জ। শুধু রাস্তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেও।

দৌড়লো বাচ্চা, বুড়ো সবাই। কাশলো সমানে খক খক খক। চোখ বেয়ে নেমে আসছে পানি।…

পানি। কারবালার ময়দান হয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর। সবাই ছুটেছে পুকুরের দিকে। একটু পানি এক টুকরো উজ্জ্বল হীরের চেয়েও দামী।…

…পানি। আহত ছাত্রটির গলা ঠেলে অতি কষ্টে বেরিয়ে আসে একটি শব্দ। কিছুক্ষণ আগে যে রুমালগুলো ভিজিয়েছিলাম প্রত্যেকেই তার মুখে নিংড়ে দিই।‥আমার বাড়িতে খবর দেবেন। নাম আবুল বরকত, ঠিকানা বিষ্ণুপ্রিয় ভবন, পল্টন লাইন।…” (একটি বেওয়ারিশ ডায়েরী: মূর্তজা বশীর)

“আবুল বরকত, সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার

কী আশ্চর্য, কী বিষণ্ণ নাম! একসার জ্বলন্ত নাম।…

আর আমরা সেই শহীদদের জন্যে
তাঁদের প্রিয় মুখের ভাষা বাংলার জন্যে
এক চাপ পাথরের মতো এক হয়ে গেছি।...
এখানে আমরা পৃথিবীর শেষ দ্বৈরথে দাঁড়িয়ে,
দেশ আমার, স্তব্ধ অথবা কলকণ্ঠ এই দ্বন্দ্বের সীমান্তে এসে
মায়ের স্নেহের পক্ষ থেকে কোটি কণ্ঠ চৌচির ক'রে দিয়েছি :
এবার আমরা তোমার।...
আজ তো জানতে এতটুকু বাকি নেই মাগো,
তুমি কী চাও, তুমি কী চাও, তুমি কী চাও।"

(হাসান হাফিজুর রহমান)

"ইমাম সাহেব মোনাজাত করলেন : 'হে আল্লাহ্, আমাদের অতিপ্রিয় শহীদানের আত্মা যেন চির শান্তি পায়। আর যে জালিমরা আমাদের প্রাণের প্রিয় ছেলেদের খুন করেছে তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায় তোমার দেওয়া এই দুনিয়ার বুক থেকে। এইসব ফেরাউনদের খেয়ালখুশিতে যেন আমাদের মানুষ সন্তান-সন্ততিদের আর জান বলি দিতে না হয়। হে আল্লাহ্, তুমি আমাদের মত শোকসন্তপ্ত উৎপীড়িতদের মোনাজাত কবুল করো।" (একুশের ঘটনাপঞ্জী : কবিরউদ্দিন আহ্মদ)

"পাঁচটি আঙুল আস্তে আস্তে গুটিয়ে এলো। পাঁচ আঙুলে মিলে একটা মুঠোর জন্ম হল।

নির্ঘুম শহরের প্রতিটি রোড-ষ্ট্রীট-লেন-বাইলেনের জনতা সমুদ্রের বুক থেকে কুয়াশার মত পাকিয়ে পাকিয়ে অগণন মুঠো আকাশের বুকে উঠে গেল।

নিষ্কম্প্র সব হাত।" (রক্তাক্ত স্বাক্ষর : সালেহ্ আহমদ)

১৯৫৪।

২৩শে এপ্রিল ঢাকা শহরে পৌঁছুতেই দুবছর আগে উত্তোলিত সেই অসংখ্য হাত বিজয়গর্বে আমাদের জড়িয়ে ধরল। বাংলা ভাষার মুখ যারা উজ্জ্বল করেছে, তাদের মুখের দিকে তাকালাম। ইঁটের শহীদস্তম্ভ জালিমের দল ভূলুণ্ঠিত করলেও প্রস্তর-কঠিন সংকল্পে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে রক্তমাংসের জীবন্ত একেকটি মিনার। একুশের সুরে বাঁধা প্রত্যেকটি হৃদয়। আর সেই হৃদয়ের তরঙ্গে তরঙ্গে কটা দিন আমরা শুধু ভাসলাম।

ভাসতে ভাসতে দেখা। তিন বেলা অবিরাম সম্মেলনের মাঝখানে সময় চুরি করে আলগোছে দেখা। যেদিকে তাকাই কচি মুখ, মুখের অরণ্য। পথ রোধ করে তারা দাঁড়ায়। অটোগ্রাফ বাজারে অটোগ্রাফের খাতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারপর শুধু শাদা কাগজে সই। অভ্যর্থনা। যেতেই হবে নইলে নিরাশ হবে সবাই। খেতেই হবে। যদি গলায় আঙুল পুরে দিতে হয়, তবুও। ভালবাসার যে কী অত্যাচার হতে পারে, কদিনে তা হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি।

তারই মধ্যে একটি ছোট মেয়ে বায়না ধরে তার সঙ্গে বাড়ি যেতে হবে। অসুবিধের কথা বলতে গিয়ে দেখা গেল চোখ তার জলে ভরে উঠেছে। সময় আমাদের হাতে নয়। তার সঙ্গে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। যাবো না বলা মানে রাস্তার মধ্যেই তাকে কাঁদানো। নিরুপায় হয়েই তাকে ঠকাতে হল। তার কান্না চোখের সামনে দেখতে হয়নি, তবু তাকে কাঁদিয়েছি।

সারাক্ষণ আলাপ। মনে রাখা যায় না এত নাম। একই নামের একাধিক মানুষ। কতদিন পর কত চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন। তারা সব কেমন আছে? কারো

সঙ্গে আলাপ কলকাতার ছাপাখানায়, কেউ কাজ করত কাগজে, কেউ বা সঙ্গে পড়ত।

তারই মধ্যে উঠে আসে এক নতুন পরিচয়। 'এই তো সবে ছাড়া পেয়েছেন জেল থেকে।' যারা জেলে গেছে তাদের খাতিরই আলাদা। আর খাতির পায় যাদের নামে পরোয়ানা ছিল, কিন্তু যারা ধরা পড়েনি তারা।

ভাষা-আন্দোলনে ধরা পড়ে জেল থেকে ফিরে এসে ঢাকার এক কুট্টি তার মহল্লার মানুষদের বলেছিল : বাইরে কি আর ভাল মানুষ আছে? ভাল মানুষ দেখতে চাও তো জেলে যাও। কথাটা মুখে মুখে সারা শহরে সেই থেকে চালু হয়ে গেছে।

যারা দুদিন আগেও লীগ-সরকারের ধামা ধরে বেড়াত, আরবী হরফে বাংলা লেখার জন্যে গলাবাজি করত, তারা রাতারাতি বেজায় বদলে গেছে। যারা আগে চোখ না রাঙিয়ে কথা বলত না, এখন তারা ভারি অমায়িক। সারাক্ষণ প্রমাণ করতে ব্যস্ত লীগের রাজত্বে তারা নাকি টুঁ শব্দটি করতে পারেনি। দেখলাম লোকে তাদের ভোলেনি। মুখের ওপর তাদের অপমান করতে ছাড়ে না। মান্যগণ্য লোক তারা। ফলে সামনাসামনি আমরা কখনও কখনও অস্বস্তি বোধ করেছি। ছাত্ররা বলেছে : না, জানেন না আপনারা —কিভাবে আমরা এক বছর মুখ বুঁজে সব সহ্য করেছি। আজও সহ্য করতে বলেন?

দিন বদলেছে। রাস্তার মোড়ে এপার-ওপার লাইটপোস্টের সঙ্গে টাঙানো প্রকাণ্ড কাগজের নৌকো। জলে বৃষ্টিতে ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু নির্বাচনের স্মৃতি বহন করে এখনও কঞ্চির কাঠামোটা টিঁকে আছে।

নৌকো। লীগবিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রতীক। নৌকো নিয়ে গ্রামে গ্রামে তৈরি হয়েছে অসংখ্য গান। বিড়ির দোকানে ছবি

টাঙানো, নৌকোর। রাস্তায় রাস্তায় দেয়ালে দেয়ালে অনভ্যস্ত হাতে আঁকা নৌকোর ছবি।

নির্বাচনের গল্প আজও লোকের মুখে মুখে। সে এক দৃশ্য। বাড়ির কেউ কখনও যা দেখেনি—মুসলমান মেয়েরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে কোমর বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে যুক্তফ্রণ্টের প্রচারে। একেকটি পরিবার ভোটের বাক্সে ভাগ হয়ে গেছে। কর্তা লীগের সমর্থক, গিন্নি যুক্তফ্রণ্টের। ঘরে ঘরে বাপে ছেলেয় তুমুল তর্ক। সবাই অনুযোগ করে বলে : কেন এলেন না তখন ?

তারপর মধুর স্টলে বসে চায়ের কাপে রসালো গল্প ফজলুল হকের নির্বাচনী প্রচার নিয়ে। এক এলাকায় যুক্তফ্রণ্টের প্রার্থী নেহাত ছোকরা-বয়সী। সেখানকার এক গ্রামের সভায় চাষীরা আপত্তি জানাল—অতটুকু ছেলে মন্ত্রী হয়ে কী করবে ? হক সাহেব তৎক্ষণাৎ এই বলে তাদের শান্ত করলেন : আমরা ঝানু লোকেরা নৌকোর হাল ধরব, দাঁড় টানব। কিন্তু বড় দরিয়ায় নৌকো চালাতে চালাতে যখন আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ব, তখন তো একটু তামুক না হলে চলবে না। সবাই যদি তখন আমরা হাল ধরতে আর দাঁড় টানতে ব্যস্ত থাকি—তামুক সাজবে কে ? তামুক সাজার জন্যে তাই আমাদের একজন ছোকরা লাগবে।

এমনি সব অনেক গল্প।

যার সঙ্গেই কথা বলা যায় শুধু এক কথা—পুরনো হাল আর কেউ বরদাস্ত করবে না। লীগ সরকারকে যেমন করে তারা উল্টে দিয়েছে, যদি কেউ বেইমানি করে তেমনি করে তাদেরও তারা উল্টে দেবে।

রাস্তাঘাটে বোরখা ছাড়াই মেয়েরা অবাধে বার হয়। আগে এ অবস্থা ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের মেয়েরা গোড়ায় পথ

দেখালেও আসলে গণ-আন্দোলনের জোয়ারেই শ্বাসরোধী পর্দা ভেসে গেছে। অবশ্য মেয়েদের এই স্বাধীনতা আজও গ্রামাঞ্চলে, এমন কি সমস্ত শহরেও স্বীকৃত নয়। কিন্তু অন্ধকার পিছু হটতে যে শুরু করেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

শহরে যানবাহনের যে অবস্থা, তাতে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের পক্ষে বাইরে বেরনো কম কষ্টকর নয়। রমনা বাদ দিলে আর সমস্ত অঞ্চলেরই রাস্তা ছোট ছোট। বাস চলে একটিমাত্র রাস্তায়। হয় পায়ে হাঁটতে হবে, নইলে সাইকেল-রিক্সা। একে ভিড়ে ঠাসা রাস্তা, তার ওপর গাড়ির ভয়ে পদে পদে প্রাণ হাতে করে হাঁটতে হয়। রিক্সার যা ভাড়া, তাতে সত্যিই নেহাত দায়ে না পড়লে বাড়ির বার হওয়া মুশকিল।

এ ক'বছরে গলিঘুঁজির মধ্যেও সিনেমা কম হয়নি। কিন্তু দেখতে হলে দেখতে হয় বাজে হিন্দি ছবি। লোকে বাংলা ছবি চায় কিন্তু পায় না। কালেভদ্রে বাংলা ছবি হলে, তা সে বস্তাপচা পুরনো ছবি হলেও, লোকে ভিড় করে দেখতে যায়।

শুধু ছবি নয়, বাংলা বইয়ের ব্যাপারেও এক জিনিস। দোকানে যান, বাংলা বই খুবই কম পাবেন। কলকাতা এত কাছে তবু বই আসে না। বই আনার অনেক বাধানিষেধ। কিন্তু অবাধে আসছে উলঙ্গ মেয়েদের ছবিওয়ালা নৃশংস রোমহর্ষক মার্কিনী বই।

বাংলা বইয়ের যে কী চাহিদা, আমাদের মধ্যে কয়েকজন দর্শনা থেকে ট্রেন করে আসতে আসতে তা বিলক্ষণ টের পেয়েছেন। তাঁদের কাছে বেশ কিছু বই ছিল সম্মেলনে প্রদর্শনীর জন্যে। স্টেশনে স্টেশনে আর স্টিমারে লোকে তাঁদের ছেঁকে ধরেছে— বইগুলো বিক্রি করুন। যা দাম তার চেয়ে বেশি দামে কিনতেও তারা রাজী।

প্রদর্শনীতে যাঁদের বই ছিল, একটা কপির জন্যেই অসংখ্য লোক নগদ টাকা হাতে গুঁজে দিতে চেষ্টা করেছেন। এত চাহিদা অথচ পূর্ব-পাকিস্তানে দরকারমত বই ছাপা হতে পারছে না। কাগজ খুবই দুষ্প্রাপ্য। যাও বা পাওয়া যায়, যে দামে কিনে যে দামে ছাপাতে হয় তাতে খদ্দেরদের পক্ষে সে দামে কেনা সম্ভব নয়।

বাংলা বই যে এমন আকাঙ্ক্ষার জিনিস হতে পারে—পূর্ব-পাকিস্তানে না গেলে সত্যিই বোঝা মুশকিল।

রাস্তায় যতটুকু ঘুরেছি, একটা জিনিস দেখে একটু অবাক না হয়ে পারিনি। অধিকাংশ দোকানেরই সাইনবোর্ড বাংলায়। কলকাতার সঙ্গে বেশ তফাত। শুধু বাংলাভাষা নয়, বাংলা হরফটাও যে কিভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ বুক দিয়ে রক্ষা করছে—তা চোখে না পড়ে পারে না।

অনেকেই আমাদের জিজ্ঞেস করেছে : আচ্ছা, আপনাদের ওপর হিন্দির অত্যাচার চলে না?—জবাব হয়ত একটা দিয়েছি, কিন্তু মনে মনে কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করেছি।

ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আরও একটা দুর্বলতা ধরা পড়ল। বাংলা ভাষায় লেখালেখি করলেও অনেক বেশি ইংরেজি শব্দ কথাবার্তায় আমরা ব্যবহার করি। ষোল আনা বাংলা বলার দিকে এমন কি ইংরেজি-পড়া ছাত্রদেরও প্রবল ঝোঁক চোখে না প'ড়ে পারে না। সাধারণ লোকের মধ্যে এমন কি কাজকর্মের চিঠিপত্রও বাংলায় লেখারই রেওয়াজ বেশি।

পূর্ব-পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনের সারিতে বরাবর থেকেছে ছাত্রেরা। ছাত্রদের অধিকাংশই এসেছে গ্রাম থেকে। ছুটি হলে গ্রামেই ফিরে যায়। অধিকাংশই কৃষকেরই বাড়ির ছেলে। তাই গ্রামের সঙ্গে নাড়ীর যোগ। লীগবিরোধী

মনোভাব এত ব্যাপক হওয়ার পেছনে, নির্বাচনে লীগের পরাজয়ের পেছনে ছাত্রদের দান অসাধারণ।

প্রতিক্রিয়ার শিবির তা বোঝে। মার্কিন প্রচার-দপ্তর তাই ছাত্রদের বিপথে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে দুহাতে টাকা ঢালছে। গ্রন্থাগার খুলে বিনামূল্যে তারা পাঠ্য বই ধার দিচ্ছে, ইউনিয়ন নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্রদের দেদার টাকা জোগাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিনী প্রভাব এমনভাবে উচ্চমহলে কাজ করছে যে, কুখ্যাত সোভিয়েট-বিদ্বেষী বই 'অ্যানিম্যাল ফার্ম' তারা ইণ্টারমিডিয়েটে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করাতে পেরেছে।

কোন কোন গ্রন্থ-প্রকাশককেও মার্কিনপক্ষ এইভাবে হাত করছে। কাগজ যেহেতু দুষ্প্রাপ্য, সেইজন্যে তারা যোগাচ্ছে বিনামূল্যে কাগজ। শর্ত এই যে, তাদের নির্বাচিত বই বাংলা ক'রে বার করতে হবে। সম্প্রতি একটি প্রকাশকের সঙ্গে একটি গল্পগ্রন্থের ব্যাপারে চুক্তি হয়েছে। মার্কিনপক্ষ প্রথমে তাদের কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী বই গছাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রকাশক প্রতিষ্ঠানটি লোকভয়ে তাতে রাজী হয়নি।

মার্কিন টাকা ছড়ানোর গল্প যে-কোন কাগজের অফিসে কিংবা লেখকদের আড্ডায় বসলে শুনতে পাবেন। অখণ্ড বাংলার একজন গদিচ্যুত নামকরা নেতা মার্কিন টাকায় রাজনৈতিক পার্টি খুলেছেন এবং নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে হেরে গেছেন—প্রকাশ্যেই তাঁর সম্বন্ধে লোকে বলাবলি করে।

মার্কিনবিরোধী মনোভাব বিশেষ ক'রে ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক। তাছাড়া আইন সভার অধিকাংশ সদস্যই তো যুক্তভাবে পাক-মার্কিন চুক্তির বিরুদ্ধে সই দিয়েছেন।

সম্মেলনের ফাঁকে ফাঁকে ঢাকা শহরের মানুষের সঙ্গে যেটুকু কথা বলেছি, তাতে মনে হয়েছে—নিজের দেশের প্রতি ভালবাসায়

আর আত্মবিশ্বাসে সেখানকার সাধারণ মানুষ আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছে। পুরনো শৃঙ্খল তারা ছিঁড়বে, নতুন ক'রে আর শিকল পরতে চায় না।

ভাষার প্রতি ভালবাসার ভেতর দিয়ে সাড়ে চার কোটি মানুষ আজ বাধামুক্ত নতুন জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে।

যে বর্ধমান রাজপ্রাসাদ নুরুল আমীনের বাসস্থান ছিল, সে প্রাসাদ আজ জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত। সে বাড়িতে বাংলা ভাষার আকাদেমি হবে। সম্মেলনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এই বাড়িতেই হয়েছিল। নুরুল আমীন কিভাবে দেশের মানুষের খুনে হাত রক্তাক্ত করেছে, প্রদর্শনী উপলক্ষে এই বাড়িতেই তার সচিত্র প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছিল।

ভাগ্যের খুবই সামান্য, একটু নিষ্ঠুর পরিহাস মাত্র।
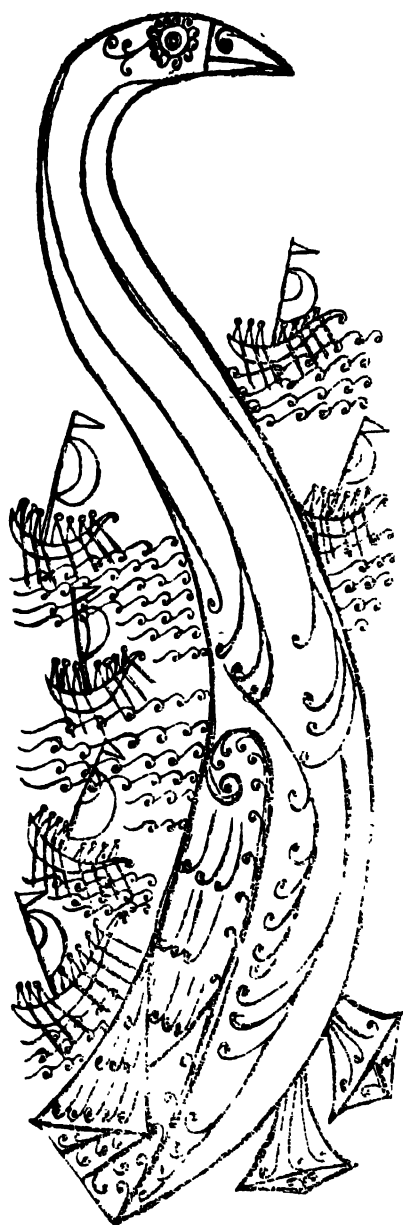
লিখতে বারণ

লিখতে বারণ। তাই—
আমি হই বুড়ো
আংলা। চলি সুবচনীর
পিঠে। নিচে জল-থৈ থৈ
জল-বেহুলার দেশ।

হাওয়া বইছে সাঁই
সাঁই। গর-হাওয়ায়
ঝাঁকুনি।

বুকটা ধড়াস ধড়াস
ক'রে ওঠে। যদি পড়ে
যাই?

নিচে খাই-খাই দূরত্ব।
ঠন্ ঠন্ করছে গাছ ওষধির
সবুজ ডাঙা। না, তুলতুল
করছে ময়ূরের পেখম?
কী জানি কী?

যতদূর দেখা যায়।

ছাড়া ছাড়া গাঁ। ঘরবসত। টিনের ছাউনি। কেন্নোর মত রেল।
ডোবাপুকুর। সীঁথি-কাটা রাস্তা। জ্বলজ্বলন্ত নদী।

সুবচনীর পিঠ একদিকে হেলে। যদি পড়ে যাই ?

বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে ওঠে তার মুখ—যাকে ভালবাসি।

কোথায় কী। মিষ্টি মাটি। সুবচনী তার পা দুটো শান-বাঁধানো দৌড়-ঘাটে ঘষে নেয়।

সামনে। উরু উরু দেখা যায় পাটরানীর শহর।

কোন্ কেতার শহর এ ? নতুনে-পুরনোয় সই-পাতানো রাস্তা। নতুনে-পুরনোয় আড়ি-আড়ি কোঠাবাড়ি।

শহরে ঢুকতেই। এ-দেয়ালে নৌকো। ও-দেয়ালে নৌকো। শহর জুড়ে শুনি নৌকোর জয়-জোকার।

নৌকো দেয়ালে কেন ? নৌকো জলে নয় কেন? সবাই এ-ওর দিকে চেয়ে বলে : তাইতো !

সার-সার সাইকেল-রিক্সা। যারা চালাচ্ছে, তারা ভাব করছে যেন চালাচ্ছে পক্ষীরাজ। হাতে চাবুক নেই। হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হর্নটাকেই বাজাচ্ছে। আর টাকরায় জিভ ঠেকিয়ে টকটক শব্দ তুলছে।

চিনি না শুনি না। ছুটতে ছুটতে এল একদল লোক। জড়িয়ে ধরে পাখির ভাষায় বলে উঠল—এতদিন কোথায় ছিলে ?

সত্যিই তো! কোথায় ছিলাম? পেছনে দেখবার চেষ্টা করলাম।

আমার ঠিক পেছনেই একজন। কনুইয়ের ঠিক ওপর থেকে একটা হাত কাটা। চোখে চোখ পড়তেই পাখির ভাষায় সে বলে উঠল : আমি বরকতের ভাই। আমি সালামের ভাই।

একটু দূরে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল একজন। চোখে চোখ পড়তেই সেও পাখির ভাষায় বলে উঠল : আমি বরকতের ভাই।

আমি সালামের ভাই। জিজ্ঞেস করলাম: তোমাদের নিজেদের নাম?

সবাই একসঙ্গে পাখির ভাষায় বলে উঠল: আমরা বরকতের ভাই। আমরা সালামের ভাই।

তারপর ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করল: কী নাম তোমার? পাখির ভাষায় বলে উঠলাম: আমি বরকতের ভাই। আমি সালামের ভাই।

সবাই হাতে হাত দিয়ে, বুকে বুক দিয়ে, আমরা একসঙ্গে পাখির ভাষায় বলে উঠলাম: আমরা বরকতের ভাই। আমরা সালামের ভাই।

আর তখনিই একঝাঁক তীরের মতো টংকার তুলে আমরা ছুটে গেলাম। সেই স্তম্ভের দিকে। যেখানে গোল বেড়ার মধ্যে ফুটে আছে ফুল। ঠিক তার পাশেই ইঁটের একটা দেয়াল এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে আছে।

দেয়ালের দিকে নয়, নিজেদের বুকের দিকে সবাই হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল। ধরা গলায় বলল: আমাদের দিল্‌কল্‌জে। আমাদের জান্‌কসম।

আমরা আবার হাতে হাত দিয়ে, বুকে বুক দিয়ে, গলায় গলা মিলিয়ে পাখির ভাষায় বলে উঠলাম: আমরা বরকতের ভাই। আমরা সালামের ভাই।

দিন কাটল নেশার মত। রাত্তিরে ঘুমিয়েছি কি ঘুমোইনি।

ঘুরে ঘুরে শোনা। এ-গল্প সে-গল্প। এ-ছইয়ে সে-ছইয়ে। এ-গলুইতে সে-গলুইতে। এ-গলি সে-গলি। ঘুরে ঘুরে দেখা। এ-মুখ সে-মুখ।

দোকানে পান কিনি। দেয়ালে ফ্রেমে-আঁটা নৌকো। জিজ্ঞেস

করি : নৌকো দেয়ালে কেন ? নৌকো জলে নয় কেন ? দোকানী পান মুড়তে মুড়তে বলে : তাইতো !

সওয়ারির আসনে নৌকোর ছবি এঁকে ঘোড়ার গাড়ির কচুয়ানের ভঙ্গিতে যে রিক্সা চালাচ্ছিল, সেও বলল : তাইতো ! তারপর দাঁড় টানার ভঙ্গিতে পা দিয়ে রিক্সা ঠেলতে লাগল।

যেখানে এনে পৌঁছে দিল, দেখি লোকে লোকারণ্য। ক্ষ্যাপা শহর গান শুনছে। পাখির ভাষায় গান। থেকে থেকে ক্ষ্যাপা শহর হাঁক দিচ্ছে : আমরা বরকতের ভাই। আমরা সালামের ভাই।

দাড়িওয়ালা এক বুড়ো মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে কী যেন বলল। জল-বেহুলার দেশের কথা। পাখির ভাষায় কথা বলল।

না। বলল না। লোকটা ছবি আঁকল।

আকাশে শাদা কবুতর। মাঠে কলকলানো ধান। শকুন নেই। বাজপাখি নেই।

ঘরে ঘরে গোলা উঠছে। যার গতর তার জমি। আঁটি আঁটি ধান উঠছে। না। লোকটা বলল না। মুখে মুখে ছবি আঁকল।

যার ঘর নেই তার ঘর। নদীতে বাঁধ। ঘরে ঘরে জল আর ঝাঁপুই খেলবে না।

জল-বেহুলার রাজ্যের সেই লোকটা। নড়ল না চড়ল না। মুখে মুখে কেবল ছবি আঁকল।

পাটরানীর দেশে। হাটে-মাঠে-বাটে চাকার ঘর্ঘর। কল হবে। যার কাজ নেই সে কাজ পাবে।

নড়ল না চড়ল না। লোকটা ছবি আঁকল।

বুড়োর কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি। উঠে দাঁড়িয়ে সবাই পাখির ভাষায় কলকলিয়ে উঠল : আমরা বরকতের ভাই। আমরা সালামের ভাই।

হাতে হাতে যেন নৌকোর পাল তুলে জয়-জোকার দিল। বাজপাখির দলের কিছু লোক। ভিড়ের মধ্যে গা ঢেকে ছিল। ভাঙা হাটে এ-দিক সে-দিক কানাকানি করতে লাগল।

আধা পাখির ভাষায় আধা বাজপাখির ভাষায় তারা বলাবলি করতে লাগল : কাফের! কাফের! শরীয়ত যে আর রইল না।

শুধু কানে নয়। কথাটা যে যার কাগজে তুলল। সেই কাগজেই যারা সীসের হরফ সাজায়, তারা দেখি কাগজ কেটে লাল শালুর উপর নতুন রকমের হরফ সাজাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম : কী ব্যাপার?

পাখির ভাষায় তারা বলল : কাল যে ধ্বজা ওড়ানোর দিন। সারা দুনিয়া জুড়ে কড়া-পড়া হাতে পতপতিয়ে ধ্বজা উড়বে।

পরদিন পল্টনের মাঠ কালো কালো মাথায় ছেয়ে গেল। ওপরে আসমান লাল। ঝাঁকে ঝাঁকে ধ্বজা উড়ছে। এখানেও সেই গানের আসরের দাড়িওয়ালা বুড়ো। এবার বুড়ো ছবি আঁকে না। কথা দিয়ে কামান দাগে। ধুকপুকিয়ে মরা নয়। মরদের মত মাথা উঁচু করে বাঁচা। হাত পেতে মিলবে না। হাত মুচড়ে পেতে হবে। সবাই এক হলে কে ঠেকায়?

বুড়ো বলছে। বলছে না। আগুনের ভাঁটা ছুঁড়ছে। বাজপাখি নখে ধার দিচ্ছে। হুঁশিয়ার।

পাখির ভাষায় বুড়ো বলছে। বলছে পাখিদের। বলছে না। মুখে আগুন ছুটছে।

বুড়ো কথা শেষ করতেই পাখির ভাষায় সবাই বলে উঠল : সামাল নৌকো! হুঁশিয়ার।

তারপর চলতে লাগল মিছিল। মশালের আলোয় দেয়ালে দেয়ালে আঁকা নৌকোগুলো জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল।

মিছিলের পায়ে পায়ে নৌকোগুলো নড়ছে। আর সেইসঙ্গে

পাখির ভাষায় নারা উঠছে আকাশ কাঁপিয়ে : আমরা বরকতের ভাই। আমরা সালামের ভাই।

সুবচনীর সঙ্গে ফের সেই শান-বাঁধানো দৌড়-ঘাটে দেখা। রেগে আগুন। তাকে বোঝালাম সোঝালাম। তবে আমাকে পিঠে নিয়ে উড়ল।

আস্তে আস্তে কয়েক ফোঁটা জল পড়েছিল আমার চোখ থেকে। শহরের লোক ভেবেছিল বৃষ্টি।

আর হজমিগুলি হাতে নিয়ে যে আমাকে বসে বসে খাওয়াত সেই আমার ক্ষুদে বেড়াল ঠাকুরঝি? সেও কি ভেবেছিল বৃষ্টি?

আশ্চর্য। ফেরবার সময় অত উঁচুতে উঠেও ভয় করেনি। ঠাস্ ঠাস্ করে ঝড়ো বাতাস এসে লাগছিল সুবচনীর পিঠে।

গর-হাওয়ায় তলিয়ে যেতে যেতেও ভয় করেনি। পড়ে গেলেই বা। ধুলো ঝেড়ে দিব্যি উঠে দাঁড়াব। আমি দেখে এসেছি নরম তুলতুলে মাটি। গায়ে দিলে ঠাণ্ডা।

যদি সে মাটিতে ঘা দাও, ঝন্ঝন্ করবে সমস্ত শরীর। মাটি নয়। ঝামার মত দাঁত বসাবে।

পাক দিয়ে দিয়ে সুবচনী নামে। অন্য এক শহরে, অন্য এক শান-বাঁধানো দৌড়-ঘাটে পা ঘষে ঘষে সুবচনী থামে।

তেমনি নরম। তেমনি মিষ্টি মাটি।

অন্য কেতার শহর। ঝল্মল্ করছে আলো।

শহরে ঢুকতেই ছুটতে ছুটতে এল একদল। পাখির ভাষায় কল্কলিয়ে উঠল তারা : ভালো আছে তো সব?

আমি বুড়ো আংলা নই। আমার সুবচনী হাঁস নেই। নইলে—

বাজপাখির দল যখন পাটঘরে ওদের নখ দিয়ে গলা ছিঁড়ল—বজ্র হাতে নিয়ে আমি ছুটে যেতাম।

আমি বুড়ো আংলা নই। আমার সুবচনী হাঁস নেই। নইলে—

বাজপাখির দল যখন ওদের হাতে হাত-কড়া পরিয়ে মারতে মারতে রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেল—

এক হাতে পাশ, এক হাতে অঙ্কুশ নিয়ে আমি ছুটে যেতাম।

আমি যে বকরতের ভাই। আমি যে সালামের ভাই।

পাখির ভাষায় আমি যে কথা বলি। পাখির ভাষায় আমি যে গান গাই।

মাঝে মাঝে খবর পাই। মাঝে মাঝে পাই না।

যে আমাকে সাইকেলের রডে বসিয়ে ঘুরে ঘুরে শহর দেখিয়েছিল, সে এখন কোথায়?

যাকে ছাড়া এক পা চলা যেত না, ছড়া লেখবার মিষ্টি হাত ছিল যার। সে?

যার সঙ্গে দেখা করব বলেও দেখা করে আসতে পারিনি, সগু ছাড়া পাওয়া আমার সেই অনেক দিনের বন্ধুটি কোথায়?

আর সেই সাহিত্য-পাগল ছেলেটা? যে আমাকে চিঠি লিখত? কেন লেখে না সে?

যে মেয়েটি গান শুনিয়েছিল। সে কোথায়? বজ্র-মানিক দিয়ে গাঁথা হে আষাঢ়—গাইতে গাইতে নেচে উঠেছিল যার চোখ? তার চোখে কি এখনও বিদ্যুৎ জ্বলছে? আর আমার সেই ছোট্ট ভাইটা? আসবার সময় যার কাঁধে হাত দিয়ে বলেছিলাম—তৈরি থেকো! আমার কথা কি তার মনে আছে?

কার কথা রেখে কার কথা বলব? গল্প লেখার আশ্চর্য হাত যার, বই লেখার টাকায় যাকে পড়তে হচ্ছে—সে কী লিখছে এখন?

বাজপাখির কপাল খারাপ। ফস্কে গেছে সেই বুড়ো। সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে বসে বুড়ো দিন গুণছে। দেশের কথা বুড়ো ভাবে। আর বুক ফেটে যায়। কিন্তু নখ শাণিয়ে পথ আগলে বসে আছে বাজপাখির দল। জিভ দিয়ে টস্ টস্ করে তাদের জল গড়াচ্ছে। কলার মান্দাস ভাসিয়ে জল-বেহুলার রাজ্যে ভাসানী বুড়ো যখন ফিরবে, লখিন্দর চোখ খুলে তাকাবে। বলবে : সাত ডিঙা, সাত নৌকো আমার ?

তখন আমরা দেখব : মান্দাস নয়। মান্দাস নয়। জলে ভাসছে লখিন্দরের নৌকো।

আর সবাই বুক টান করে পাখির ভাষায় হাঁক দিচ্ছে : আলি ! আলি ! আলি ! আমরা বরকতের ভাই। আমরা সালামের ভাই।

একটি অমানুষিক কাহিনী

এক ফিরিঙ্গির কাছে শস্তায় হাতঘড়ি কিনে বেজায় ঠকেছিল আমার এক বন্ধু। ট্রামে করে বাড়ি আনতে না আনতে ঘড়িটা খোঁড়া হয়ে গেল।

চোখের সামনে থাকলে পাছে বরাবরের মত আপশোস হয়, তাই একদিন চা-সিঙ্গাড়া খাইয়ে এক রকম জোর করেই সে উপহার বলে ঘড়িটা আমাকে গছিয়ে দিল।

আমি নিতে রাজী হলাম খোলটার জন্যে। সোনার মত চকচকে। চোরে ভুল করে না নেওয়া পর্যন্ত অন্ততপক্ষে টেবিল সাজানো যাবে।

আমার যে সব ঘড়িয়াল বন্ধু আমার হাতখালি দেখে মনে মনে দুঃখ পেত, আমার হাতে যাহোক একটা ঘড়ি দেখে তারা বেজায় খুশি হল। তক্ষুনি ধরে-পাকড়ে নিয়ে গেল মেরামতের দোকানে। নিজেরা পয়সা খরচ ক'রে ঘড়িটাকে দাঁড় করিয়ে দিল। সেই থেকে ঘড়িটা দাঁড়াল তো বটেই, তুড়দাড়িয়ে চলল। এক-বাস লোকের মধ্যে প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েও একটু কান খাড়া করে থাকলেই তার টিক-টিক আওয়াজ শুনতে পেতাম। মনে ক'রে দিনে তিনবার দম দিলে রাস্তার লোককে চাই কি ঠিক সময়ে ট্রেন পর্যন্ত ধরিয়ে দিতে পারত।

বিলিকে কিনে ঠকেছিল আমাদের আর এক বন্ধু। একে চৌরঙ্গীর রঙীন সন্ধ্যে, তায় ধবধবে শাদা—পাঁচ টাকায় কিনে ভেবেছিল খুব দাঁও মারা গেছে।

দিনের আলোয় ধরা পড়ল—বিলিতি তো নয়ই, একেবারেই স্বজাতি।

সুতরাং আমার স্ত্রীকে কুকুরটা সে গছিয়ে দিল। বিনা পয়সায় পাওয়া বলেই হোক কিংবা ফর্সা রং বলেই হোক, আমার স্ত্রীর কাছে সেই জানোয়ারটা বিলিতি কুকুরের মত ব্যবহারই পেল। বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করবার পরও যখন তার কান দুটো কিছুতেই দু-পাশে ঝুলে পড়ল না, তখন শুধু তার নামটার মধ্যে একটুখানি সন্দেহ ঝুলিয়ে রাখা হল। শেষের অক্ষরটা কেটে দু-অক্ষরে নাম হল তার 'বিলি'।

গোড়া থেকেই ব্যাপারটাতে আমার সায় ছিল না। চার পায়ে যারা হাঁটে তাদের সঙ্গে এমনিতেই এত বিষয়ে আমাদের এত বেশি মিল যে, আবার শখ করে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে আমার সাহস হয় না।

তার ওপর দু-আনার ছাঁট কিনতে গিয়ে রোজকার বাজারে যখন মাছে টান পড়তে লাগল, তখন আমার স্ত্রীকে এ-কথাও জানাতে ছাড়লাম না যে, মাথাপিছু রেশনের বরাদ্দ চালে এমনিতেই আমাদের নাতিবৃহৎ সংসারটা টায়েটুয়ে চলে। আমার কথায় না আমার স্ত্রী, না বিলি—কেউই কান দিল না। একরকম আমাকে অগ্রাহ্য করেই বিলি খাড়া কান নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বড় হতে লাগল।

বিলিকে আমার ভালবাসা উচিত—কথাটা দিনকতক শোনবার পর গলার চেন ধরে টানতে টানতে একদিন ভোরবেলায় লেকে বেড়াতে নিয়ে গেলাম।

একজন মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কী কুকুর?' পুরো পাক না ঘুরেই চলে এলাম।

মাস কয়েকের মধ্যেই কলকাতার বাস উঠিয়ে লরির ওপর লটবহর চাপিয়ে আমাদের চলে যেতে হল কাছাকাছি এক গ্রামে। আমরা চলে যাচ্ছি—এই কথাটা বিলি লোক ডেকে সারা রাস্তা জানাতে জানাতে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই শুনে ভারি অপমান লাগল যে, পাড়ার লোকে বিলির নামে আমাদের পরিচয় দিচ্ছে।

আমাদের এক বন্ধু রাস্তার মোড়ে একবার আমাদের খোঁজ করেছিল, নাম শুনে কেউই বলতে পারেনি। যখন বলল দু-জনেরই চোখে চশমা, নতুন এসেছে—তখন সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল : বুঝেছি, বুঝেছি বিলিদের বাড়ি। এই রাস্তা দিয়ে গ্রামের মধ্যে সোজা ঢুকে যান, নমাজডাঙার বাঁ দিকে পুকুর। তার ঠিক পাশেই।

গ্রামে এসে বিলির মুখের ভাব বদ্‌লে গেল। রাস্তা দিয়ে

যেই যাক্, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে। কিন্তু চেনা হোক অচেনা হোক রাস্তার যে-কেউ যদি বাড়িতে ঢোকে, বিলি আহ্লাদে আটখানা হয়ে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। কিছু-দিনের মধ্যেই জানা গেল জান-মাল পাহারা দেবার ব্যাপারে বিলির ওপর একটুও ভরসা করা চলে না।

ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে বিশ্বাস করে না বলেই যে বিলি চোর-ছ্যাঁচড় সম্বন্ধে এত উদাসীন তা মোটেই নয়। আসলে সে ভীতুর একশেষ। একদিন দেখি একটা পুঁচকে দেশী কুকুর মুখের সামনে খেঁকিয়ে ওঠায় বিলি ভয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

বিলির যত বিক্রম বাড়ির মধ্যে। কথায় কথায় আমাকে দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে। বসে লিখছি, হঠাৎ লেখার কাগজের এক দিকটা ছোঁ মেরে টান দিয়ে নিয়ে চলে গেল।

বাড়ির মধ্যে তাকে সামলানো মুস্কিল। ক্রমেই সে লায়েক হয়ে উঠছে। বেড়ার ধারে এসে গ্রামের আর পাঁচটা কুকুর তাকে ভাংচি দেয়। একদিন দেখি কিছুটা দূরে লাল রঙের একটা রাশভারি কুকুর একদৃষ্টে বিলির দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের দিকে চোখ পড়তেই সে পালিয়ে গেল। দেখে বুঝলাম বিলিও মজেছে।

বিলির কৌলিন্য সম্পর্কে আমার স্ত্রী মোহমুক্ত না হওয়ায় বার বার নতুন চেন কিনে আমাকে অনবরত অর্থদণ্ড দিতে হচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত বিলিই আমাকে বাঁচাল। একই সঙ্গে শেকল আর বেড়া ভেঙে নিজের মুক্তি সে নিজেই আদায় করে নিল।

চা না খেলেও সকাল-বিকেলে জল খাবারের ভাগটা তার চাই। তারপর বার হত পাড়া বেড়াতে। বামাদার বাড়িতে রোজ তার একবার যাওয়া চাই। তাকে যতই দেওয়া হোক ছোট মেয়েটার হাতে রুটি দেখলেই সে কেড়ে খাবে। অথচ বিলিকে কারো কিছু

বলবার হুকুম নেই। লাই দিয়ে দিয়ে বামাদারা বিলিকে মাথায় চড়িয়েছেন। সাজ্জাদ-দার বাড়িতে পাঠশালা খুলেছে আমার স্ত্রী। একদিন দেখে তার আগেই বিলি সেখানে গিয়ে হাজির। আমার স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে পাঠশালার মেয়েদের শাসন করার দায়িত্বটা সে নিজের হাতেই নিয়েছে। আমার স্ত্রীর হাতে সেই প্রথম মার খেয়ে বিলি যতটা না কাঁদল, তার চেয়ে ঢের বেশি অবাক হল।

আস্তে আস্তে বিলিটা একেবারেই বয়ে গেল। সকালে জল-খাবার ফেলে মহানন্দে বাঁশবনে ঘুরে বেড়ায়। কখনও জলায় যায়, কখনও ময়লা ডিপোয়। গোড়ায় গোড়ায় বাইরে দাঁড়িয়ে কাপের গায়ে চামচে নেড়ে শব্দ করলে যেখানেই থাকুক ছুটে আসত। পরে এমন হল, তার অ্যালুমিনিয়ামের মিলিটারি বাটিটা ঢুম্ ঢুম্ করে বাজাতে বাজাতে ভেঙে ফেললেও আর আসত না।

বিলির এই বারমুখো হবার সময়টাতে রুসি এসে আমাদের ঘাড়ে ভর করল। রুসির জন্ম বেড়ালের বংশে।

রুসিকে রাখার ব্যাপারে বিলির একেবারেই মত ছিল না। দিনকতক সারা বাড়ি রুসিকে তাড়া করে বেড়ালো, মাঝে মাঝে লোমগুলো খাড়া করে রুসি এমনভাবে টান্ টান্ হয়ে উঠে দাঁড়াত আর ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে মুখে শব্দ করত যে, বিলির আর এগোবার সাহস হত না। একদিন দেখি ক্ষুদে রুসি বিলির সামনে এসে দু-পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঠাস্ করে চড় কষিয়ে দিল। পালোয়ান বিলি রাগে গরগর করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

আস্তে আস্তে বিলির সঙ্গে রুসির ভাব হয়ে গেল। উঠোনের একছিটে রোদ্দুরে বিলি হাঁটুতে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে আর তার পেটের ওপর হেলান দিয়ে ঘুমোয় রুসি। থাবা বার ক'রে রুসি যখন ইঁদুর কিংবা আরশোলার ওপর বীরত্ব ফলায়, বিলি জুল্ জুল্

করে তাকিয়ে দেখে। রুসির নিষ্ঠুর খেলায় এ বাড়িতে বিলিই একমাত্র উৎসাহী দর্শক।

পাশেই জমিলাদের বাড়ি। মিউনিসিপ্যালিটির বাগানে মালির কাজ করে জমিলার দাদা। রুগ্ন বুড়ো বাপ ভালো দেখতে পায় না, শরীর একটু ভাল থাকলে ঠকঠকি তাঁতে হাত কাঁপিয়ে গামছা বুনতে হয়, মাঝে মাঝে ঝাড়ফুঁক ক'রে জলপড়া দিয়ে সামান্য কিছু রোজগার হয়। সব মিলিয়েও জমিলাদের সংসার চলবার মত নয়।

আমরা যখন না থাকি রুসি খেতে যায় জমিলাদের বাড়ি। রাত্তিরের অন্ধকারে সামনের পুকুর থেকে জমিলাকে মাছ ধরতে হয়, মাছ নইলে রুসির আবার ভাত রোচে না। এদিকে বাঁশবন, ওদিকে কসাইখানা—খাবার ভাবনা নেই বিলির। রাত্তিরে বেড়ার ধারে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুজনে অপেক্ষা করে, পুকুরের ও-মুড়োয় আমাদের পায়ের শব্দ পেলেই দুজনে চিনতে পারে। বিলি নিঃশব্দে তীরবেগে ছুটে এসে কাদা-ঘাঁটা দুটো পা গায়ের ওপর তুলে দেয়, রুসি কাঁটাঝোপের গা ঘেঁষে মিউ মিউ ক'রে বিলির বিরুদ্ধে একগাদা নালিশ জানায়।

যেদিন আমরা ফিরতাম না, সেদিন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর জমিলাদের বাড়ি খেয়ে রাস্তা পেরিয়ে কওশেরের মার কাছে রুসি যেত শুতে। বড় বাড়ির কুকুরগুলো বেজায় মারকুটে। তাই বাঁশবাগানের ভেতর দিয়ে এক-হাঁটু কাদা ভেঙে এক অজ্ঞাত রাস্তায় বিলি শুতে যেত বামাদাদের দাওয়ায়। সারাটা সকাল চলে যেত বিলির গা থেকে জোঁক তুলতে আর এঁটুলি বাছতে।

রাখবার সময় সবাই বলেছিল রুসি খুব কাজে লাগবে। ইঁদুর তো ধরবেই, এমন কি ছোটখাটো সাপের হাত থেকেও রুসি নাকি

আমাদের রক্ষা করবে। রুসি আসবার পর ইঁদুরের উৎপাত খুব যে কমল তা নয়। নখ দিয়ে জখম করলেও ইঁদুর খুন করতে রুসিকে বড় একটা দেখা যায়নি। খুঁচিয়ে কষ্ট দেবার চেয়ে মেরে ফেলা যে অনেক ভালো, এটা তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারা যায় নি।

আমাদের বাঁচানো দূরে থাক, একদিন দেখি রুসিই ঘরের মধ্যে বিপদ ডেকে আনছে। বিলির উত্তেজিত ডাক শুনে রুসির দিকে চোখ পড়ল; বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে রুসি ভেতরে ঢুকছে। তার মুখে একটা লিকলিকে নিস্তেজ সাপ। আমাদের দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে রুসি লাফিয়ে বিছানায় উঠল। তারপর সাপটাকে ছেড়ে দিল। ভেবেছিলাম মরা সাপ। ছেড়ে দিতেই দেখি জিভ লক্‌লক করে রুসির দিকে তেড়ে যাচ্ছে। রুসি কিছু বলল না। নির্বিকারভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল। সাপটা কাছে আসতে রুসি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকে খানিকক্ষণ নখের ওপর ধ'রে নাচাল, তারপর আবার তাকে বিছানার ওপর নির্বিকারভাবে ছেড়ে দিল। আমরা ভয়ে কাঠ হয়ে থাকলাম। ভয়টা রুসির জন্য নয়; বর্তমানেরও নয়, আমাদের ভয় হল ভবিষ্যৎ ভেবে। আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় রুসি যদি আচমকা কোনো সাপ এনে বিছানায় তোলে! আর সাপটা যদি বিষাক্ত হয়!

রুসির কাণ্ডকারখানা দেখে বিলিও কম উত্তেজিত হয় না। কিন্তু রুসি কাউকে কেয়ার করলে তো।

সেবার চটকলে কী একটা গণ্ডগোল হওয়ায় আমাদের দুজনের নামেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরলো। গোটা গ্রাম আমাদের লালকেল্লা। দিনের বেলাটা আমরা বাড়িতেই থাকি। দু-তিন

জায়গায় ছেলেমেয়েদের দল আছে পাহারায়। রাত্তিরটা শুধু এর বাড়িতে. ওর বাড়িতে সরে থাকি। গ্রামের সব বাড়িতেই আমাদের অবারিত দ্বার। সব চেয়ে মুশকিল করল বিলি। গ্রামে প্রচারে বেরোবার সময় বিলি আমাদের পেছন পেছন ঘুরত, তাড়িয়ে দিলে খানিকক্ষণ পরে ঠিক দেখা যেত ও আমাদের সঙ্গে চলেছে। শেষ পর্যন্ত আমরা হাল ছেড়ে দিতাম।

কিন্তু গা ঢাকা দেওয়া অবস্থাতেও বিলি আমাদের পেছনে লাগল। যত রাত্তিরে যে বাড়িতেই আমরা যাই না কেন বিলি ঠিক আমাদের খুঁজে বার করবে। আমাদের ধরিয়ে দেবার জন্যে পুলিশের সঙ্গে তার যেন গোপনে একটা বন্দোবস্ত হয়েছে। বিলির ওপর প্রচণ্ড রাগ হত। কিন্তু গলায় একটা চামড়ার ছেঁড়া বক্‌লেস থাকলেও বিলি তখন আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে। কিছু বলা গেল না। সপ্তাহ কয়েক পরে পরোয়ানা উঠে যাওয়ায় সে যাত্রা যাহোক আমরা রক্ষা পেলাম।

কিছুদিন পরে আমাদের সংসার বাড়িয়ে তুলল বিলি। কাকে সে পছন্দ করেছিল জানি না। তার বাচ্চাগুলো হল হতকুচ্ছিৎ—নেড়িরও অধম। বিলির বাচ্চা আগে থেকেই বায়না করা ছিল। সবাইকে দিয়ে থুয়ে আমাদের হাতে একটিও থাকল না।

বিলি কিছু দিন ঘরমুখো হয়েছিল। শান্ত, মায়ের মন্থর স্বভাব বিলিকে ভারি সুন্দর মানিয়েছিল। আমরা ভাবলাম বিলিকে বুঝি ফিরে পাওয়া গেল।

দুদিন যেতে না যেতেই বুকের দুধ যেই শুকিয়ে এল, বিলি অমনি যে-কে সেই। বাচ্চাগুলোকে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে বিলি সারাদিন উধাও। বাচ্চাগুলোর জ্বালায় মাঝে মাঝে বিলি রাত্তিরেও ফিরত না।

রুসিরও এদিকে ধাড়ি ধাড়ি সাপ ধরবার বয়স হল। কিন্তু বয়স বাড়লেও তার গাম্ভীর্য এল না। এখনও সে লেখবার সময় লাফ দিয়ে আমার ঘাড়ে চড়ে বসে।

আজকাল প্রায়ই রাত্তিরে মাছ রান্না হয়। আমার স্ত্রীর কাছে শুনি সামনের পুকুরে সাপুঁইদের বাড়ির ছেলেরা মাছ ধরে। মাঝে মাঝে তারাই নাকি মাছ পাঠিয়ে দেয়।

বিকেলে একদিন বাড়িতে ফিরে বই নিয়ে বসেছি। হঠাৎ খুট করে শব্দ হতেই চেয়ে দেখি রুসি বেশ বড়োসড়ো একটা মাছ টানতে টানতে বাড়িতে ঢোকাচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম সাঁপুইদের বাড়ির ছেলেরা ছিপ ফেলে মাছ ধরতে বসেছে। রুসির মুখ থেকে মাছটা কেড়ে নিয়ে যাদের মাছ তাদের ফিরিয়ে দিয়ে এলাম।

সে রাত্তিরে আমাদের বাড়িতে মাছ হয়নি। বুঝলাম বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুসি খুব সংসারী হয়ে উঠেছে।

একদিন ছুটতে ছুটতে এলেন বামাদার মা। আমি বাড়িতে ছিলাম না।

বিলিকে নাকি কসাইখানার লোকেরা পিটিয়ে মেরেছে। শুনে আমার স্ত্রী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছিল, গিয়ে দেখে বিলি মরে নি। কিন্তু যে কষ্ট পাচ্ছিল তার চেয়ে তার মরে যাওয়া ভাল ছিল। হাড়-পাঁজরগুলো ভেঙে গেছে। মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে। বেঁচে থাকলেও কোনদিনই বোধ হয় আর সে উঠে দাঁড়াতে পারবে না। আমার স্ত্রী তাকে কোলে তুলে বাড়ি আনল। রোদ্দুরে শুকোতে দেওয়া ছাগলের একটা দামী চামড়া বিলি দাঁত দিয়ে কেটে নষ্ট করে ফেলেছিল। তাই রাগের মাথায় তারা বিলিকে বেদম ঠেঙিয়েছে। সমস্ত শুনেও বিলির জল-টস্‌টসে চোখের

দিকে তাকিয়ে সকলেরই মনে হয়েছিল মানুষের হাতে অবোলা জীবটার শাস্তি একটু যেন বেশিই হয়ে গেছে।

আমাদের বাড়ির পাশের রাস্তাটা দিয়ে কশাইখানার যে কালো ছেলেটা ছাগল চরাতে যেত, কঙ্কালসার বিলিকে দেখে সেও একদিন চোখের জল মুছল।

তারপর একদিন ভোরে উঠে দরজা খুলেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। ঠ্যাং দুটো সামনে ছড়িয়ে চোখ উল্‌টে পড়ে রয়েছে আমাদের আদরের বিলি—জিভটা বেরিয়ে রয়েছে সামনের দিকে।

কান্না চাপতে চাপতে আমার স্ত্রী পাশের ঘরটার দিকে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।

ছুটে গিয়ে দেখলাম রুসির কোলে দু-দুটো ফুট্‌ফুটে বাচ্চা—তাদের গা থেকে চেটে চেটে সে রক্ত মুছিয়ে দিচ্ছে।

রুসির বাচ্চা দুটোকে ভারি সুন্দর দেখতে হল।
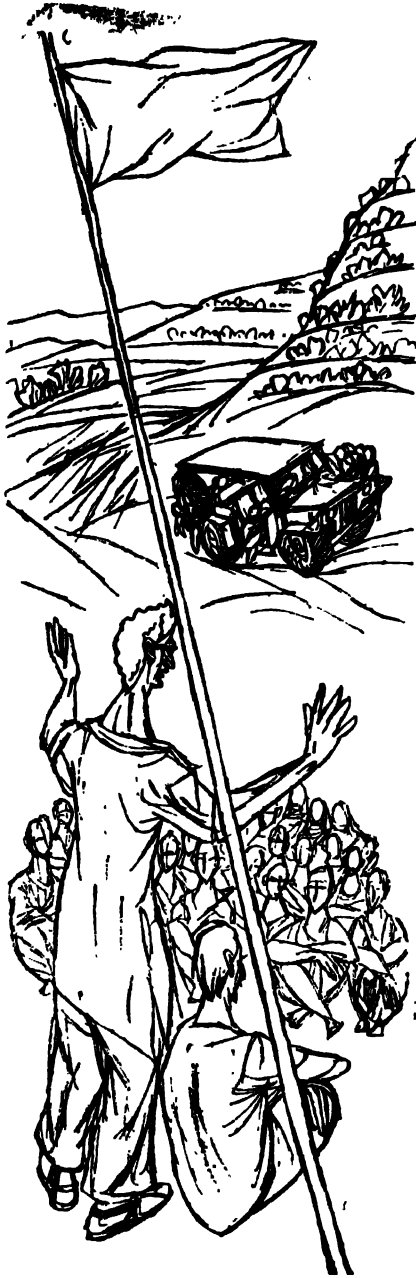
আমাদের গাড়ি

মণিহারী ঘাটে একটা খালি কামরায় উঠে পড়ে সবে আমরা হাত পা ছড়িয়ে শুয়েছি। এমন সময় আমাদের ভুল ধরা পড়ল। এ-গাড়ি অন্য রাস্তায় যাবে।

একে অন্ধকার, তায় এক হাঁটু বালি। গাড়ি তখন ছাড়ে ছাড়ে। লটবহর নিয়ে পড়ি-মরি করে ছুটতে হল।

সঙ্গী ভদ্রলোক ভিড়ের মধ্যে যে কোথায় হারিয়ে গেলেন আর খুঁজে পেলাম না।

দু-তিন ঘণ্টার

আলাপ। রোদ্দুরে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন। বলেছিলাম, 'আপনি বসুন, আমি খানিকক্ষণ দাঁড়াই।' ভদ্রলোক কিছুতেই বসলেন না। একটা পাকানো সিগারেট এগিয়ে দিলেন।

তারপর যা হয়। ভাব জমে উঠল।

ট্রেন থেকে নেমে বেশ খানিকটা হেঁটে স্টিমারে উঠতে হয়। ভদ্রলোক কিছুতেই ছাড়লেন না। আমার সুটকেসটা বয়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার জিনিসপত্তর?'

'ভাববেন না—ও ঠিক এসে যাবে।'

শুধু চা-তেষ্টা নয়, খিদেও পেয়েছিল। সকালে ট্রেন ধরবার তাড়ায় ভালো করে খাওয়াও হয়নি। পকেটে যা পয়সা আছে, তাতে হেসে-খেলে দুজনের খাওয়া হয়ে যায়।

কিন্তু ফেরবার সময় হবে মুশ্‌কিল।

ভদ্রলোককে টেনে নিয়ে গিয়ে স্টিমারের রেস্তোরাঁয় বসলাম। উনি নিজেই অর্ডার দিলেন। খাবারের নামগুলো শুনে জিভে জল এল বটে, কিন্তু মনে মনে একটু না ঘাবড়ে পারলাম না! এ-গল্প সে-গল্প করে মনের ভাবটাকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করলাম।

বিল এল। ভদ্রলোক আস্তে করে ধরে পকেট থেকে আমার হাতটা সরিয়ে দিলেন। ভারি সঙ্কোচ হচ্ছিল। কিন্তু ওঁর মুঠোটা ছিল শক্ত।

টেবিলের ওপর চোখ পড়ল। বিলের ওপর শিরা-ওঠা একটা হাত। আমার তো নয়ই, ও ভদ্রলোকেরও নয়।

তৃতীয় একটি হাত আমাদের পেছন থেকে এসে পড়েছে।

একটু অবাক হয়ে ফিরে তাকালাম।

এক প্রৌঢ় পাঞ্জাবী। একমুখ শাদা দাড়ি।

বিলের ওপর থেকে তার হাতটাও সরিয়ে দিতে ভদ্রলোকের

বেশি জোরের দরকার হল না। হাতটা সরে যেতে ভদ্রলোক নিচু গলায় আমাকে বললেন, 'দেখলেন? বলেছিলাম না বাক্সবিছানা ঠিক এসে যাবে!'

স্টিমার তখন চলতে আরম্ভ করেছে। কথাটার ঠিক থই পেলাম না।

দুজনে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে নোঙর বাঁধার লোহার ওপর এসে বসলাম। গুঁড়ি গুঁড়ি জল গায়ে ছিটকে ছিটকে এসে লাগছে। সারাদিন জ্বলুনি পুড়ুনির পর ভারি ভাল লাগছিল। আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে একজন লোক জলে রশি ফেলে ফেলে চোঙের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুর করে করে কী একটা মাপের কথা ওপরে বার বার হেঁকে হেঁকে জানাচ্ছিল।

নদীটা পেরোতে বেশিক্ষণ লাগে না। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক নিজের কথা বললেন।

কলকাতার এক ছোট্ট গলিতে তাঁর গাড়ি-মেরামতের কারখানা। তার ওপর একটা উপরি কাজ নিয়েছেন ইন্সিওরেন্সের। মোটর গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়লে সরজমিনে তদন্ত করে খেসারতের পরিমাণ ঠিক করতে হয়। এ কাজটা তিনি ঠিক পেশার জন্যে নেননি, নিয়েছেন নেশার জন্যে।

নেশা তাঁর ঘুরে বেড়ানোর। তাই এই কাজটা নেওয়া। সপ্তাহের পাঁচটা দিন দাঁতে দাঁত দিয়ে যন্ত্রপাতির মধ্যে ডুবে থাকা। শনিবার হলেই বেরিয়ে পড়া। যেখানে হোক। যত দূরেই হোক।

কাজটা নিয়ে বেশ সুবিধেই হয়েছে। কোম্পানীর ঘাড়ের ওপর দিয়ে নেশার খরচাটা উঠে আসে। তাছাড়া, ইচ্ছে করলেই এ থেকে বেশ দু-পয়সা হয়ও। খেসারতের অঙ্কটা টেনে একটু বাড়াতে আর কী? কলমের শুধু একটা দুটো খোঁচা।

'সর্দারজীকে দেখলেন, ও তো সেই তক্কেই আছে। ওরই গাড়ি। গিয়ে হয়ত দেখব গাড়িটার এমন কিছুই হয়নি, কিংবা অনেক আগেই কলকব্জাগুলোর ডানা গজিয়েছে। চোখটা শুধু একটু ছোট বড় করার ব্যাপার। তাহলেই কয়েক শো টাকা ঘরে এসে যাবে। কিন্তু টাকা নিয়েই বা কী হবে বলুন? আমি একা মানুষ কী করব অত টাকা নিয়ে?' গলার স্বরটা অন্ধকারে কাঁপতে লাগল।

'বিয়ে করেননি?'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। একটু অন্যমনস্কের মত কী একটা জবাব দিলেন। হ্যাঁ কিংবা না—ভোঁর শব্দে ঠিক শোনা গেল না। স্টিমার ঘাটে এসে ভিড়ল।

এতক্ষণ তাঁর হাত আর সুন্দর মুখের যে পোড়া দাগগুলো দেখেও না দেখার ভান করেছিলাম, ঘাটের উজ্জ্বল আলো যেন ইচ্ছে করে আঙুল দিয়ে দিয়ে সেই দাগগুলো দেখিয়ে দিতে লাগল।

পোড়া দাগগুলোর ইতিহাস ভদ্রলোক নিজে থেকেই বলতে শুরু করেছিলেন, যখন আমরা ভুল ট্রেনে উঠে খালি কামরায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়েছি।

স্টিয়ারিং-এ হাত দিলেই হঠাৎ তাঁর মাথায় ভূত চাপে। মাটি থেকে এক লাফে উড়ে যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছের তালে তাল দিয়ে স্পীডোমিটারের কাঁটাটা তখন লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। এই মরিয়া স্বভাবের জন্যেই একটা গাড়ির ইঞ্জিনে একবার আগুন ধরে যায়। দাগগুলো সেই আগুনে পোড়ার।

অনেকদিন আগের কথা। কলেজে পড়া একটি ফুটফুটে মেয়ে তখন তাঁকে ভালবাসত। তারপর?

কিন্তু তার পরের কথাগুলো আর শোনা হল না।

হঠাৎ শুনতে পেলাম সর্দারজী হন্তদন্ত হয়ে ডাকছে।

এটা ভুল ট্রেন। পাশের প্ল্যাটফর্মে আসল গাড়ি এক্ষুনি ছাড়ছে। ধড়মড় করে উঠে পড়লাম।

মাঝরাতে বড় জংশনে নেমে ভদ্রলোককে অনেক খুঁজলাম। কিন্তু পেলাম না। সর্দারজীকেও নয়।

নিশ্চয় গাড়িতে উঠতে পারেননি। নয়তো মাঝখানের কোন স্টেশনে নেমে গেছেন।

রাস্তায় দু-দণ্ডের আলাপ। গল্পের শেষটুকু শোনা না হলেই বা কী আসে যায়?

এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠেই ভদ্রলোককে ভুলে গেলাম।

ট্রেন যখন থামল, বাইরে ফুটফুটে সকাল।

দূর থেকে স্টেশনটা দেখা যাচ্ছিল। চারদিকে ধূ ধূ করছে মাঠ। স্টেশনটা যেন মাঝখানে উবু হয়ে ব'সে আছে। তার ঢেউ-খেলানো টিনের ছাদে বসে বসে ঢুলছে কে? কঙ্কপাখি?

স্টেশন থেকে বাইরে এলে ফাঁকা মাঠ। মাঠের কোল আলো ক'রে রোদ-ঠিকরানো রাস্তা। এক কোণ উঠে গেছে ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার নীলচে পাহাড়ে।

আর-এক কোণে সুতোলি নদী। পাড় দেখে সন্দেহ হয় বর্ষার জল এলে ফুলবে, ফুঁসবে, ভাঙবে। এপার থেকে ওপার টান-টান হয়ে আছে লম্বা পুল।

পুল পেরোলে শহর।

হাত-দেখানো পুলিস। সামনে রাস্তা দু-ভাগ হয়ে গেছে। ডানদিকে এগোতেই নাকে এসে লাগে পোড়া মবিলের গন্ধ। সারি সারি দোকান। মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ভাঙা ঝরঝরে রংচটা মাডগার্ড, ছেঁড়া উলিডুলি টায়ার। সরু সরু নলে শিস দিতে দিতে চাকায় হাওয়া ঠাসবার শব্দ।

রাস্তার বাঁদিকে আঁস্তাকুড়ে-ফেলা রোগা লিকলিকে রেলের লাইন। এককালে এর হাড়-বার-করা বুকের ওপর দিয়েই গাড়ি যেত। দেখলেই বোঝা যায়। এখন উলঙ্গ হয়ে শুয়ে ধুঁকছে। তার ঘুনধরা কাঠগুলোর ওপর কোথাও ফলওয়ালার টুকরি, কোথাও চুলের কাঁটাফিতে, কোথাও পানবিড়ি।

দেশী-মদেশী। এদেশী-ভিনদেশী। কত রকমের মুখ। নাক খাঁদা-খাঁদা। গলায় নীল নীল পুঁতির মালা। এই গরমেও গায়ে যাদের পশমের জামা, তারা অনেক উঁচু পাহাড় থেকে এসেছে। কেউ ধবধবে শাদা, কেউ কুচকুচে কালো, কারো রং দুধে আলতার মত। তার ওপর লাল-কালোর উল্কি।

এত সব রং নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বহুরূপী শহরটা যেন পায়ে চাকা বেঁধে ঘুরছে।

বাঁদিকে বাসের আড্ডা। তাহলে এই ডানদিকের গলিটা—

বাড়িটা খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হয়নি। হাজার হোক ছোট্ট শহর। সকলেই সকলের নাম জানে।

অনেকদিন থেকেই আসব আসব করছিলাম। এসে পড়ায় বন্ধু খুশি হলেন। বন্ধুর স্ত্রীও। মেয়ের বয়স কত হল? দু-বছরের? ভারি সুন্দর দেখতে হয়েছে তো!

ট্রেনের জামাকাপড় ছেড়ে চা খেতে বসলাম। অনেক সব গল্প জমে আছে। আস্তে আস্তে বলব। এমন সময় চিড়বিড় করে মাথার ওপরে শব্দ হল। ছাদটা কাঠের। জানলার দিকে তাকিয়ে দেখি—বৃষ্টি।

সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কাপটা ঠকাস করে নামিয়ে রেখে বন্ধুটি ছুটলেন। কাঠের মেঝেটা কাঁপতে লাগল। তক্তাগুলো বেজায় পুরনো। কোন্‌দিন ভেঙে না পড়ে।

চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। এত দেরি করছে কেন? বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বন্ধু উঠোনে নেই। বাইরে যাবার দরজাটা খোলা। বারান্দার এক কোণে সরে গেলে রুজু রুজু দেখা যায়। পাশ থেকে একটা জীপ নজরে পড়ছে। বন্ধুর রোগা রোগা হাতদুটো একটা ত্রিপল দিয়ে জীপটাকে ঢেকে দেবার চেষ্টা করছে।

এইবার মনে পড়ল। বাড়িতে যখন ঢুকি, তখনই জীপ-গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। তখন দেখে কিছু মনেই হয় নি। হবে হয়ত কারো জীপ। রেখে ভেতরে গেছে।

কিন্তু জীপের মালিক যদি এ বাড়িতে আসত, তাহলে তো তাকে দেখতেই পেতাম। তাহলে কি পাড়ার কারো গাড়ি? এদের বাড়ির সামনে রেখে গেছে?

তাই যদি হবে, আমার বন্ধুটিই বা কেন অমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যাবে! আর ত্রিপলটা? ত্রিপলটা কার?

হয়ত গাড়ির মধ্যেই ত্রিপলটা ছিল। আগে থেকেই হয়ত বলা আছে যদি, বৃষ্টি আসে যেন ত্রিপল দিয়ে গাড়িটা ঢেকে দেওয়া হয়। এখানে যা ছিঁচকাঁদুনে বর্ষা! এই রোদ, এই বৃষ্টি। এই বৃষ্টি, এই রোদ। আকাশের কোন মাথার ঠিক নেই।

বন্ধু ফিরতে ফিরতে কাপের চা জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছিল। গামছা দিয়ে গা মাথা মুছতে মুছতে এক চুমুকেই ঠাণ্ডা চা শেষ হয়ে গেল।

রান্নাঘরের দাওয়া থেকে বন্ধুপত্নীর গলা পাওয়া গেল, 'আর এক কাপ করে চা হবে নাকি?'

'মত আছে।—'ওটা আমার বন্ধুর কথা বলবার একটা ধরন। ঠিক 'ছ' নয়, বরং 'স'-র মত শোনায়। জেলখানায় আমরা হেসে হেসে মরে যেতাম।

ক্ষিধে পেয়েছিল খুব। চুনোমাছ আর কাছিমের মাংস।

আর কোন তরকারি নয়। শেষ পাতে আধ বাটি ঘন দুধ। খুব খরচের মধ্যে ফেলেছি জেনেও হাপুস হুপুস করে খেলাম। আমার জন্যে চিনেমাটির বাসন। বাকি সকলে খেল কলাই-করা থালায়।

বন্ধু দুপুরে বেরোলেন। বিড়িমজুরদের সঙ্গে একটু বসতে হবে। সন্ধ্যেবেলা আবার একটা মিটিং। একটু দূরে। তাড়াতাড়ি ফেরবার চেষ্টা করবেন। আমার বক্তৃতাটা শোনবার ইচ্ছে আছে।

যাবার সময় স্ত্রীকে বললেন, 'ত্রিপলটা শুকিয়ে গেলে বাড়ির মধ্যে তুলে রেখো।'

আবার খুব চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলাম। গাড়ি যারই হোক, ত্রিপলটা তাহলে এ-বাড়িতেই থাকে? বৃষ্টি এলে এ বাড়ির ত্রিপল দিয়ে গাড়িটা ঢেকে দেওয়া হয়। সম্পর্কটা পাতানো তাহলে। নেহাৎ ঠুনকো। যার জীপ সে নিয়ে গেলেই সম্পর্কটা চুকে যাবে। গাড়ি থাকবে না, কিন্তু ত্রিপলটা থাকবে।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে, যার গাড়ি তারই ত্রিপল। দুটোই সে এদের কাছে রেখে গেছে। রেখে না গেলে দুয়োরের সামনে গাড়িটা দিনভর দাঁড়িয়েই বা থাকবে কেন?

এর কোনটাই যদি না হয়? তাহলে যেটা হয়, সেটা হওয়া অসম্ভব।

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। চোখ খুলে দেখি বেশ বেলা হয়েছে। টিম টিম করছে রোদ্দুর। ঘরে খাট একটাই। ছোট্ট মেয়েটা আমার পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। শব্দ শুনে ধরতে পারছি বন্ধুপত্নী রান্নাঘরে। চা এসে যাবে এখুনি।

দুপুরের সেই ভাবনাটা মনের মধ্যে এখনও কাঁটার মত খচ খচ করছে। গাড়ি আর ত্রিপল কেন একই লোকের হতে যাবে?

বারান্দার কোণে গিয়ে একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিলাম গাড়িটা এখনও আছে কিনা। দেখলাম আছে।

চা আসবার আগে ঘরের ভেতরটা একবার ভাল করে দেখে নেবার কৌতূহল চাপতে পারলাম না।

যেটাতে শুয়ে ছিলাম, সেটা দামী সাবেককালের খাট। পায়াগুলো ফেটে গেছে। চাদরের এককোণ উঠে গিয়ে তোষকের তালি-মারা চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। ছেঁড়া আটপৌরে কাপড়ের পাড়-জোড়া-দেওয়া বালিশের ঢাকা। জানলার সামনে আমকাঠের একটা টেবিল। তার ওপর কয়েকটা পুরনো খবরের কাগজ পাতা। ঘরের ঠিক মাঝখানে নতুন ক্যানভাস লাগানো পুরনো একটা ঈজিচেয়ার। তার ঠিক মুখোমুখি শস্তা কাঠের হাতলভাঙা একটা চেয়ার।

ঘরটা বড়। পিছনদিকটা অন্ধকারমত। এক কোণে গাদাবন্দী বস্তাকয়েক ধান আর কলাই। নিজেদের জমির ধান বোধহয়। তার প্রায় গায়ে গা দিয়ে আছে ছোট একটা আলনা। তার ভেতরে একটা নতুন কোরা কাপড় ভারি জমকালো দেখাচ্ছে। আলনাটার ঠিক পাশে মেঝের ওপর শাদা একটা দাগ। উঁহু শাদা নয়, সোনালি। এগিয়ে যেতেই দাগটা মিলিয়ে গেল। আরও কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম ও-জায়গার তক্তাটা ভাঙা। দূর থেকে যেটা নিচু হয়ে দেখছিলাম, আসলে সেটা বাইরের পড়ন্ত রোদ্দুর।

এতক্ষণ চোখ পড়েনি। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম খাটের শিয়রে এক কোণে পড়ে আছে মর্চে-ধরা একটা লোহার সিন্দুক। ডালাটাকে এমনভাবে বন্ধ করা যে টানলেই খোলা যায়। আর সেই লোহার সিন্দুকটাকে বোধ হয় হেসে উড়িয়ে দেবার জন্যেই একটা দাঁতভাঙা চিরুনি কোলে নিয়ে তার মাথায় চড়ে বসেছে

এ বাড়িতে কোনদিন কারো বিয়েয়-পাওয়া 'সুখে থাকো' লেখা আয়নাটা।

পায়ের শব্দে তাকাতেই দেখি বন্ধুপত্নী চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে। চা নিতে গিয়ে হাতটা দেখে নিলাম। লোহা আর শাঁখা ছাড়া কিছু নেই।

জীপটা যে পরের, সে ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকল না। আমাকে নিতে লোক এসেছিল। পাটডাঙা কাপড়জামা পরে বেরিয়ে গেলাম।

দরজায় তখনও জীপটা দাঁড়িয়ে।

সভা সেরে রাত্তিরে ফিরতে দেরি হল। দূর থেকে দেখলাম গাড়িটা নেই। নিশ্চয় যার জীপ সে নিয়ে গেছে। হঠাৎ হুম করে পেছন থেকে হেডলাইট এসে পড়তেই এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। ফিরে তাকিয়ে দেখি সেই জীপ হুস্ করে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর আমাকে অবাক করে দিয়ে গাড়ি থেকে একে একে নামলেন আমার বন্ধু, তাঁর নিরাভরণ স্ত্রী আর দু-বছরের ছোট রোগা মেয়েটা।

আবার সব গোলমাল হয়ে গেল। ছোট্ট মেয়েটা আমার সন্দেহ যেন আরও পাকিয়ে তোলবার জন্যেই বলল, 'কাকু, দেখ আমাদেল গালিতা।' ও তো ছোট্ট মেয়ে, ওর কথার দাম কী ?

রাত্তিরে খেতে বসে বন্ধু বললেন, 'ইস্, আপনার বক্তৃতাটা শোনা হল না।' বন্ধুর স্ত্রী বললেন, 'চা-বাগানের মেয়েরা দেরি করিয়ে দিল। তাও কি উঠতে দেয় ! শেষটায় মেয়ের অসুখের বাহানা দেখিয়ে চলে এলাম।'

বন্ধু বললেন, 'কাল আর আপনাকে ছাড়ছি না। এত দূরে যখন এলেনই, চা-বাগান না দেখে যাওয়ার কোন মানেই হয় না।'

তারপর একটু থেমে আমার দিকে একটু অর্থপূর্ণ ভাবে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'তাছাড়া এখন আমাদের গাড়ি হয়েছে, আর ভাবনা কী ? হুস্ করে চলে যাবো।'

আশ্চর্য, আমার হাসি পেল না। 'আমাদেল গালি' যদিও বা সহ্য হয়েছিল, 'আমাদের গাড়ি' কিছুতেই হল না।

সিঁড়ি ভেঙে উঠতে গিয়ে যেন একগাদা বাসন হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। নিজের মনকে জিজ্ঞেস করলাম : এ কি ঈর্ষা ? মন কোন জবাব দিল না। কিন্তু আমি ভাল করেই জানি, এখানে চুপ করে থাকা মানে সায় দেওয়া নয়।

থেকে যেতে হল পরের দিন। সকালে খবর এসেছিল নক্সাল-বাড়ির এক চায়ের বাগানে আজ একটা গোলমাল হতে পারে। গোলমালটা না দেখে যাই কেমন করে ?

বিকেলে সাঁই সাঁই করে ছুটল জীপগাড়ি। চাকায় যেন মাটি ঠেকছে না। একবার করে শব্দ হয় 'হৈ', আর জীপটা অমনি থেমে পড়ে। কখনও একজন, কখনও দুজন করে লোক ওঠে। কারো হাতে হাট থেকে শস্তায় কেনা বোয়াল মাছ ; কারও হাতে ধুলোসুদ্ধ, শাকডাঁটা ; কেউ নেশা করেছে, মুখে ভক ভক করছে গন্ধ। যার যার বাড়ির কাছে এসে লোকে নেমে পড়ছে। কিন্তু আবার উঠছেও তেমনি। কেউ সাঁওতাল, কেউ ওরাওঁ, কেউ মুণ্ডা, কেউ কোল। ছত্রিশ জাতের লোক। চা-বাগানের কুলি। গাড়ির মধ্যেটা সারাক্ষণ ঠাসাঠাসি হয়ে আছে। থামলে মদ, মাছ আর গায়ের দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। চললে দমকা হাওয়ায় তবু কিছুটা সোয়াস্তি।

'হৈ' বললেই থামতে হবে ? এ আবার কী কথা ? আরও তো অনেক জীপ আছে। দিব্যি ফাঁকা ফাঁকা। কই রাস্তার

কোন লোক তো তাতে উঠছে না। যার জীপ, সেই যখন কিছু বলছে না—চুপ করে থাকাই ভাল। এমনিতে আমারও হয়ত কিছু মনে হত না। কিন্তু—কোলে মেয়ে নিয়ে এক কোণে বসে থাকা বন্ধুর স্ত্রীর দিকে তাকালাম। কোন ভাবান্তর নেই। ভিড়ের মধ্যে দিব্যি সহজ নির্বিকার হয়ে বসে আছেন। এরপর আমার আর কী বলার থাকতে পারে!

চা-বাগানের পাশ দিয়ে জলকাদা ভেঙে বস্তির কাছে একটা ছোট্ট মাঠের মধ্যে জীপ এসে দাঁড়াল। ইউনিয়নের মাথা মাথা কয়েকজন লোক ছুটে এল।

ধোঁয়াটে নীল পাহাড়ের মাথায় বিকেলের আকাশটা ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। হঠাৎ দেখলাম, একজন মাটিতে একটা লাল নিশান পুঁততে লেগে গেছে। সভা হবে।

বন্ধুর স্ত্রী মাঠের একপাশে আমাকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগছে?' আকাশের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ভারি সুন্দর।' তারপর একজন লোকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ঐ যে ওঁর সঙ্গে কথা বলছে, ঐ লোকটাকে দেখুন। ওর ইতিহাসটা খুব মজার।'

পরে সব শুনলাম।

লোকটার নাম ইউসুফ। গায়ের রং ওরাওঁদের ছেলের মত। মিশমিশে কালো। মুখটা বাঙালী-বাঙালী। চোখা নাক। সব সময় চোখ পিট পিট করে। তাতে আরও সুন্দর দেখায়।

ইউসুফের বাবা ছিলেন পাশেই এক চা-বাগানের ম্যানেজার। তাঁর বউ-ছেলেমেয়ে দেশে থাকত। এখানে এক ওরাওঁ মেয়েকে মনে ধরায় তাকে তিনি বিয়ে করেন। ইউসুফ সেই ওরাওঁ স্ত্রীর সন্তান। তারপর তিনি ওরাওঁ স্ত্রীকে নিয়ে দেশে চলে যান। ইউসুফ সেখানে গাঁয়ের স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। পড়াশুনো ভালোই

করছিল। কিন্তু বাবা হঠাৎ মারা যাওয়ায় দুদিনও আর তারা সে সংসারে ঠাঁই পেল না। ছোট ছেলেকে নিয়ে মাকে আবার সেই চা-বাগানেই ফিরে আসতে হল। আর সে ম্যানেজারের বউ নয়। বস্তিতে থাকা কুলিকামিন। লড়াইয়ের সময় ইউসুফের মা মারা গেল।

ইউসুফ কপাল ফেরাতে চলে গেল কলকাতায়। প্রতিজ্ঞা করল, শহরে যদি মরতেও হয় চা-বাগানে আর ফিরবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরতে গিয়েও শহরের ফুটপাথটা বোধ হয় বড্ড শক্ত ঠেকেছিল। তাই ধুঁকতে ধুঁকতে চা-বাগানের মাটিতেই আবার তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল।

তারপর দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই। বিয়ে। ভালবাসা। স্ত্রী। পুত্র। ইউনিয়ন। লালঝাণ্ডা। জীবনের এই অনিবার্য একঘেয়ে দিকগুলো তো আছেই।

এরই মধ্যে একদিন একটা খবর ছড়িয়ে পড়ল। ইউসুফ দালাল হয়ে গেছে। বাঘা বাঘা সাহেবদের সামনেও যার ঘাড় কেউ নিচু হতে দেখেনি, এমন হল সেই ইউসুফই বাগানের কাউকে দেখলে চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারে না। ইউনিয়ন সেবার সাংঘাতিক ঘা খেল। যে হরতালটা হবার কথা ছিল, সেটা হল না।

শেষ পর্যন্ত কী হল, ইউসুফ নিজেই এসে ইউনিয়নের কাছে ধরা দিল। সভায় সকলের সামনে সে তার দোষ স্বীকার করল। জাত গিয়েছিল ইউসুফের। আবার সে জাতে উঠল।

তারপর থেকে ইউসুফ একেবারে অন্য মানুষ।

গলার আওয়াজ শুনে পেছনে তাকিয়ে দেখি সভা শুরু হয়ে গেছে। ইউসুফ বলছে।

লোক জমেছে অনেক। খুব গলা-চড়ানো বক্তৃতা নয়। যেমন

স্বাভাবিকভাবে লোকে কথা বলে। বাগানের এক মেয়ের গায়ে ম্যানেজার হাত দিয়েছিল। সেই কথা হচ্ছে। আগেকার দিন হলে কিছুই হত না। কিন্তু দিনকাল বদলেছে। মেয়েটা উল্টে চড় মেরেছে ম্যানেজারকে। বলেছে, 'এ কি তোমার নিজের বউ পেয়েছ?' শুনে বুড়ির দল খুব হাসল। বাগানে হাঙ্গামার খবর পেয়ে সেক্রেটারি ছুটে এসেছিল। সঙ্গে এসেছিল থানার বন্দুক-ধারী গাড়িকয়েক সেপাই। কিছুতেই কিছু হয়নি। ম্যানেজারকে বাগান থেকে সরিয়ে দিতে হয়েছে। পাতি নেই বলে যাদের বসিয়ে রাখা হয়েছিল, দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে পাতি আছে—এখন তারা কাজ পাবে।

অল্পক্ষণের সভা। শেষ হতেই মেয়েরা ঘরে ছুটল রাঁধতে। বস্তির ছোট ছেলেরা হৈ হৈ করে ছুটে এল গাড়ি চড়তে। ইউসুফ ছুটে গিয়ে গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসল। গাড়ি সত্যিই চলতে শুরু করেছে। বনবাদাড় ভেঙে রাস্তার দিকে। গাড়িটাকে দেখাচ্ছে ঠিক মা-ষষ্ঠীর মত।

একটু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাঙবে না তো?'

বন্ধু বললেন, 'ভাঙবে কেন? ইউসুফ পাকা ড্রাইভার।'

জানে না এমন কাজ নেই। বাগানে তো এখন গাড়িই চালায়। তাছাড়া ইউনিয়নের গাড়ি। তরাইয়ের মজুরের পয়সায় কেনা। ভাঙলে যে ইউসুফও ঠকবে।

কানে অর্কেস্ট্রার মত বাজতে লাগল:

ইউনিয়নের গাড়ি। 'আমাদেল গালি'। আমাদের গাড়ি।

এক মুহূর্তে সমস্ত ধাঁধাঁ পরিষ্কার হয়ে গেল।

দূর থেকে ভেসে আসছে ধুলোমাখা উলঙ্গ ছেলেদের আনন্দিত কলতান। জীবনে এই তারা প্রথম নিজেদের গাড়ি চড়ছে।

একটি প্রতিবাদ পত্র

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম, আপনাদের পুজো-সংখ্যায় আমি নাকি গল্প লিখছি।

মানতেই হবে, আপনি একজন তুখোড় সম্পাদক, নইলে লেখা এড়াবার এমন একটা কৌশল আপনি খাটালেন কেমন করে ?

এই ভেবে আমার মজা লাগছে, আমার কবিতার ভয়ে শেষটায় আমার নামে আপনাকে একটা গল্প খাড়া করতে হল !

আদৌ গায়ে না মেখে ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দেওয়া যেত।

কিন্তু কপালদোষে আপনি আমার এমন একটা ব্যথার জায়গায় না জেনে হাত রেখেছেন যে, আমার পক্ষে কিছুতেই আর চুপ করে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং গায়ে পড়ে এই চিঠি।

বিজুদিকে আপনি চিনবেন না। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, বিজুদির চোখের মণি দুটো এত কালো যে সেদিকে তাকালে চোখের পলক ফেলতে মনে থাকত না। গায়ের রং কালো হলেও মুখটা মনে করে রাখবার মত। গালে সামান্য টোল খায়, কিন্তু ভ্রমরের মত কালো চোখের মণির কাছে সেটা কিছু নয়।

আট বছর অদর্শনের পর সেই বিজুদি রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ওপর একটা ট্রাম ছেড়ে দিয়ে আরেকটা ট্রাম ধরবার সময়টুকুর মধ্যে কথায় কথায় আমাকে বলেছিল: 'আমি বলে যাবো, তুই ঠিক? শুনে আমাকে একটা গল্প লিখে দিবি, বুঝলি? আসবি তো ঠিকানা মনে থাকবে?'

আমি ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম 'নিশ্চয়', 'ঠিক' এবং 'থাকবে'। ট্রাম ছেড়ে দেবার পরেও বিজুদির চোখের মণি দুটো বেশ কিছুক্ষণ দেখতে পেয়েছিলাম।

ট্রাম-স্টপে দূর থেকে দেখামাত্রই আমি চেয়েছিলাম বিজুদির কাছে ছুটে যেতে, কিন্তু মাঝখানে দাঁড়ানো আটটা বছর আমার হাত ধরে টান দিল। আমি বড় হয়েছি। রাস্তায় এখন আর আমার ইচ্ছেমত ছুটে যাবার অধিকার নেই। অথচ হেঁটে যাবার জন্যে আমার কতটা সময় নষ্ট হল।

উঃ, কতদিন পর বিজুদিকে আবার দেখলাম। কাউকে না বললেও এ ক'বছর সারাক্ষণ আমি রাস্তায় বিজুদিকেই দেখতে চেয়েছি।

বিজুদির পাশে দাঁড়িয়ে আমি তো অবাক! আমি বিজুদির

এখন একেবারে মাথায় মাথায়। গোড়ায় ভারি অস্বস্তি হচ্ছিল। ঘাড় উঁচু করে বিজুদির সঙ্গে আমার কথা বলার অভ্যেস। অস্বস্তি বিজুদিরও হচ্ছিল। আমাদের দুজনেরই দৃষ্টিকোণটা যে বদলে গেছে।

'ও মা, তুমি কত বড় হয়ে গেছ!' বিজুদির 'তুই'-এর বদলে 'তুমি'তে যেন মিইয়ে গেলাম।

একটু থেমে বিজুদি যখন বলল, 'হ্যাঁ রে, তুই নাকি কী লেখক হয়েছিস?' তখন মনে হল বিজুদি 'তুই' দিয়ে আমাকে আপন করে পরক্ষণে আবার 'লেখক' কথাটা দিয়ে পর করতে চাইছে।

লজ্জা-লজ্জা মুখ করে অন্যদিকে তাকালাম। রাস্তার মধ্যে বিজুদির দিকে একসঙ্গে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে এমনিতেই কেমন যেন লজ্জা করছিল। দেখে মনে হবার জো নেই, বিজুদি আমার চেয়ে চার বছরের বড়। তাছাড়া মুণ্ডুটা ছাড়াও বিজুদির যে ধড় আছে, এই প্রথম সেটা চোখে পড়ে যাওয়ায় আমার কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকছিল।

বাড়িতে কে কেমন আছে সমস্ত বলবার পরও যখন বুঝলাম বিজুদির সমস্তই অজানা থেকে যাচ্ছে, শুধু তখনই আমি বললাম, 'বছর দুই হল শম্ভুদা বিয়ে করেছে।'

বিজুদির মুখের ওপর দিয়ে এলোমেলো হয়ে কী যেন একটা মুহূর্তে সরে গেল। তার পরই আবার সব ঠিকঠাক।

শুনে তক্ষুনি যে ট্রামটা এসে গিয়েছিল, সেই ট্রামটাই বিজুদির ধরবার খুব দরকার হল। কী নাকি খুব জরুরি কাজ।

আর আমি ইচ্ছে না থাকলেও 'নিশ্চয়', 'ঠিক' এবং 'থাকবে' বলতে বলতে সেই ট্রামেই বিজুদিকে তুলে দিয়ে বিরাট এক শূন্যতার মধ্যে পা ফেলে ফেলে বাড়ি ফিরলাম।

সারাদিন আমার মনটা ভারি খারাপ হয়ে থাকল। শম্ভুদার

বিয়ের খবর শুনে বিজুদির মুখটা কেমন হয়ে গিয়েছিল বলে নয়, আমার ওপর বিজুদির আর সে রকম টান দেখলাম না বলে। এতদিন পর দেখা হল। অথচ আমার হাতটা ধরে একবার আগের মত বললও না যে, আগের চেয়ে আমি খুব রোগা হয়েছি। কথাটা সত্যি নয়, কিন্তু বলতে কী দোষ ছিল ?

যে কারণে দূর থেকে বিজুদিকে দেখে রাস্তা দিয়ে আমি ছুটে যেতে পারিনি, ঠিক সেই একই কারণে বিজুদিও যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার হাতটা ধরতে পারে নি, এটা আমার সেদিন একবারও মনে হল না।

বিকেলে একা লেকের ধারে ব'সে ভেসে-যাওয়া কাগজের নৌকোর মত পুরনো দিনগুলোকে জলে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঢেউ তুলে পাড়ে আনার চেষ্টা করলাম।

কেয়াতলা লেনের বাড়িটাতে তখন আমরা সবে গিয়েছি। রাস্তাটা ছিল এইটুকু। খানিকটা গিয়েই সামনে মাঠ আর পুকুর দেখে রাস্তাটা যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ডানদিকের শেষ বাড়িটায় আমরা এক তলায় দুখানা ঘরে গাদাগাদি হয়ে থাকতাম। একে বাবা ঘুষ নিতেন না, তায় দিদির বিয়ের ধার শুধতে মাইনে থেকে তখন মোটা অঙ্ক কাটা যাচ্ছিল ব'লে মা-কাকিমাদের কাচ্চাবাচ্চাসুদ্ধ, দেশে ঠাকুর্দার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আপিস-ইস্কুল যাদের তারাই শুধু কলকাতায় থাকত।

আমাদের সঙ্গে থাকত আমার কলেজে-পড়া পিসতুতো ভাই শম্ভুদা।

একদিন দুপুরে বাড়িওয়ালার স্ত্রী ওপরের কাকিমার পায়ে বাটনা বাটার ভারি শিল পড়ে গিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়েছে শুনে আমি আর শম্ভুদা ছুটে ওপরে গেলাম।

বিজুদিকে সেইদিনই প্রথম দেখি। খবর পেয়ে আমাদের আগে এসেছে। বিজুদির দুটো হাত ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে না তো যেন কথা কইছে। আমাদের দিকে চোখ তুলতে ভ্রমরের মত কালো চোখের মণি দুটো দেখতে পেলাম।

কলেজে-পড়া ছেলে শম্ভুদাও দেখলাম সেই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখে অবাক হয়ে একবার বিজুদির হাতের দিকে, একবার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

বিজুদিরা থাকত আমাদের ঠিক পেছনের বাড়িটাতে। পেছন-দিকের রাস্তার শেষ বাড়ি। রাস্তা দিয়ে ঘুরে গেলে বেশ সময় লাগবার কথা। মাঠ দিয়ে গেলেও পুকুরটা বেড় দিতে হয় বলে সময় নেহাত কম লাগে না। অথচ বিজুদি দেখি বেশ টকটক ক'রে আসে, টকটক ক'রে যায়।

আমার হাত দিয়ে ওপরের কাকিমাকে কী একটা জিনিস পাঠাবার দরকার পড়ায় বিজুদি যেদিন আমার হাত ধরে হিড় হিড় ক'রে টানতে টানতে, বাড়িওয়ালাদের একতলার রান্নাঘরের পাশ দিয়ে গিয়ে পেছনদিককার দেয়ালে-ফোটানো লুকনো ছোট্ট দরজাটা খুলে লাফ দিয়ে একেবারে সটান নিজেদের উঠোনে গিয়ে হাজির হল—সেইদিন বিজুদির চটপট আসা-যাওয়ার রহস্যটা ধরা পড়ল।

ব্যাপারটা এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেও ঠিক এক নিঃশ্বাসে ঘটেনি। কেননা বিজুদির সেই হাত ধরার মধ্যে কী ছিল জানি না, যেতে যেতে আমার কেমন যেন রোমাঞ্চ লেগেছিল।

সাজানো-গোছানো চমৎকার বাড়ি বিজুদিদের। মেয়েদের আলতা-পরা পায়ের মত মেঝে। দরজাগুলোতে এমন কল লাগানো যে, ঠেললে আপনি বন্ধ হয়ে যায়। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ঘর। রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর ছাড়াও শুধু খাওয়ার জন্যেই

একটা আস্ত ঘর—এমন নয় যে, রাত্তিরে সে ঘরে কেউ শোয়। প্রথম দিন দেখে আমার তো কেমন অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল। ৰিজুদির মার প্রকাণ্ড একটা গড়ানে ঢাকনাওলা টেবিল। সেটা খুললেই দেখা যায় রাশি রাশি টাকা।

বিজুদির মাকে দেখে প্রথম প্রথম খুব ভয় করত। একেবারেই আমার মার মত নয়। সব সময় পরনে ধোপভাঙা শাড়ি। তাতে কোন সময় হলুদের ছিটে-ফোঁটাও লেগে থাকে না। যেদিন ৰিজুদিদের বাড়িতে গণৎকার হাত দেখেছিল, সেইদিন দেখেছিলাম বিজুদির মার হাত পরিষ্কার—আঙুলের কোথাও তরকারি কুটতে গিয়ে বঁটিতে কাটার দাগ পর্যন্ত নেই। আর কেন যেন আমার মনে হয়েছিল বোনেদের মধ্যে একমাত্র বিজুদির রংই কালো বলে বিজুদির মা বিজুদিকে তেমন ভালবাসেন না।

পরে বুঝেছিলাম বিজুদির মাকে ভয় না পাবার সব চেয়ে ভাল উপায় হল তাঁর চোখের দিকে না তাকানো। একথা বোঝবার পর থেকে বিজুদিদের বাড়িতে ঘন ঘন যেতে আসতে আর আমার কোন ভয় রইল না।

শম্ভুদা বয়সে বড় হওয়ার জন্যেই বোধ হয় বিজুদিদের বাড়িতে কেউ শম্ভুদাকে যেতে বলত না। অথচ শম্ভুদা যে খুব ভাল গান গায়, এবং বেশ গলা ছেড়েই গায়, এটা তাদের অজানা থাকবার কথা নয়। ফলে, ও-বাড়ি থেকে এলেই শম্ভুদা আমাকে এমনভাবে জেরা করতে শুরু করত যে, বিজুদিদের বাড়িতে সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে না দেখে এসে আমার উপায় থাকত না। আর তাও একা ৰিজুদি সম্পর্কেই আমায় এত ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশ্নের উত্তর দিতে হত যে, তার ফলে ও-বাড়িতে সারাদিন কাটালেও এক বিজুদির সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে মেশবার ইচ্ছে থাকলেও আমার সময়ই হত না।

শম্ভুদা একদিন আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে হাতে একটা ছোট্ট খাম দিয়ে বলল, 'এক দৌড়ে গিয়ে বিজুকে দিয়ে আসবি ; আর কেউ যেন দেখে না ফেলে।' শম্ভুদা অত যে পালোয়ান মানুষ, তারও দেখলাম হাতটা কেঁপে গেল। আমার তখন একেবারেই যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু শম্ভুদা শেষ অস্ত্র ছাড়ল : 'তোকে দিয়ে এটুকু দেশের কাজও হবে না?'

কাজেই চিঠিটা আমাকে নিয়ে যেতে হল। আমার পা দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। পুলিশের ভয়ে নয়, পাছে বিজুদির মা ধরে ফেলেন সেই ভয়ে। এ-ব্যাপারটাকে পুরোপুরি স্বদেশী বলে আমার কেমন যেন খুব বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবে ওপরের কাকিমাদের ছাদের ঘরে ব'সে দুপুরে বিজুদি আর শম্ভুদা যে লুকিয়ে লুকিয়ে বিপ্লবীদের বইপত্র পড়ত, ওদের মুখ থেকেই তা আমি জেনেছিলাম। আমার বাবা সরকারী চাকরি করেন বলেই ওসব বই পড়বার সময় শম্ভুদা কিছুতেই আমাকে ওদের ধারে কাছে থাকতে দিত না।

যেদিনই এই চিঠি দিয়ে-আসা নিয়ে-আসার কাজ থাকত, দিনটাই আমার মাটি হয়ে যেত। কারণ বিজুদি আমার দিকে মন দেবার সময়ই পেত না, শম্ভুদার ওপর তখন আমার যা রাগ হত।

অন্য দিনগুলোতে বিজুদির অবসরটা থাকত পুরো আমার দখলে। আমরা হয়ত ছাদের কার্নিশে পাশাপাশি পা ঝুলিয়ে বসে মাঠটার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আর ধোপাদের শুকোতে দেওয়া শাদা ধবধবে কাপড়গুলো দড়িতে পা বাধিয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে সার্কাসের খেলোয়াড়দের মত আমাদের ট্রাপিজের খেলা দেখাত। পুকুরের ওপারে শীতের দিনে এসে এক ঘরের চালায় আস্তানা গাড়ত চেলাচামুণ্ডা সমেত ত্রিশূলধারী এক সাধুবাবা। ওদের গাঁজার কল্কেয় দম দেওয়া দেখে আমি আর বিজুদি হেসে

হেসে মরে যেতাম। কখনও কখনও আমি আর বিজুদি পাঁচিলের ওপর হাত ছেড়ে দিয়ে হাঁটতাম।

শম্ভুদা জোর করে কিছু বলতে সাহস পেত না। কিন্তু আমার রোগা শরীরে কার্ণিশে বসা, পাঁচিলে বেড়ানো, বেশিক্ষণ বাইরে থাকা যে ঠিক নয়, এই রকমের অযাচিত উপদেশ দিয়ে দিয়ে আমার কান ঝালাপালা করে দিত।

শনিবার শনিবার একজন আসতেন বিজুদিকে ছবি আঁকা শেখাতে। তাঁর আঁকার হাত হয়ত ভাল ছিল, কিন্তু চোখের তাকানোটা ভাল ছিল না। তিনি বিজুদির দিকে একরকম ভাবে কিন্তু আমার দিকে অন্যরকমভাবে তাকালেও সে সব গায়ে না মেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম প্রকাণ্ড একটা ক্যানভাসের গায়ে বিজুদি আমাদের দুজনের রোজকার দেখা আকাশটাকে দিনে দিনে কি ভাবে রং দিয়ে ফুটিয়ে তুলছে।

এক অন্ধ মাস্টারমশাই আসতেন সপ্তাহে দু-দিন বিজুদিকে বেহালা বাজানো শেখাতে। তিনি চলে গেলে বিজুদি বসত আমার ওপর ওস্তাদি ফলাতে। আমার আঙুল এমন কাঠ-কাঠ ছিল যে, তাদের বাগ মানানোর জন্যে প্রতি পদে বিজুদির হস্ত-ক্ষেপের দরকার হত। বিজুদির ধৈর্যে কুলোয়নি বলে শেষ পর্যন্ত বেহালা-বাজিয়ে হওয়ার আশা আমাকে ছাড়তে হল।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে একে একে আমার সব আশাই জলাঞ্জলি দিতে হল। পরে বুঝলাম তার কারণটা ছিল শম্ভুদা।

একদিন সকালে মনে হল বাবার ঘরে কে যেন এসে বসলেন। মুখ বাড়িয়ে দেখি বিজুদির বাবা। অত বড়লোক সাত সকালে আমাদের বাড়িতে এসেছেন। দেখেই বুঝলাম বাবার সঙ্গে নিশ্চয় এমন কোন কথা আছে, যার ধারে-কাছে আমার মত ছোট ছেলের

থাকা উচিত নয়। কোথায় যাই ভাবতে ভাবতে টুক করে খিড়কির রাস্তা দিয়ে বিজুদিদের ভেতর-উঠোনে গিয়ে পড়লাম। বিজুদির মা দাঁড়িয়ে; মুখ তোলো হাঁড়ির মত। বিজুদির ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। অন্যদিন কিন্তু এ সময়ে বিজুদি পড়ার টেবিলে বসে দাঁত দিয়ে নখ কাটে। বুঝলাম ছোট ছেলের এখানেও থাকা উচিত নয়। সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে খানিকক্ষণ বসে বসে মাছ ধরা দেখলাম। তারপর বাড়ি এলাম।

বিজুদির বাবা বাড়ি চলে গেছেন। আমার বাবা একটানা বকবার পর গুম হয়ে বসে আছেন। ভেতরের ঘরে শম্ভুদা মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। রান্নাঘরে ছোট কাকা সাগ্রহে একটা একটা করে কাগজ আগাগোড়া পড়ে ফেলে একটি একটি করে আগুনে দিচ্ছে। তাতে স্বদেশী-স্বদেশী গন্ধ থাকলেও ব্যাপারটা পুরোপুরি স্বদেশী কিনা জানবার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। পেছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখলাম। একটা মেয়ের ছবি। বিজুদির না হয়ে যায় না। সেটা উনুনের মুখে ধরবার জন্যে ছোটকাকার দেখলাম চোখ চেয়ে দেখবার দরকার হল না।

দেখে আমার খুব ভয় হয়েছিল, এই ব্যাপারটার সঙ্গে শেষটায় আমাকেও না জড়িয়ে ফেলা হয়। পরে বুঝলাম লোকে ধরেই নিয়েছে এটা নিছক শম্ভুদা আর বিজুদির মধ্যেকার ব্যাপার। আমি ছেলেমানুষ—কাজেই হিসেবের মধ্যে ঠিক পড়ি না।

সেইদিন প্রথম শম্ভুদার ওপর আমার হিংসে হল।

দিনকয়েকের মধ্যেই আমরা ভবানীপুরের দিকে একটা বাড়ি দেখে উঠে গেলাম। আমার নাম করে বাবাকে একদিন বলতে শুনলাম, 'ও বড় হচ্ছে, এখন আর বালিগঞ্জে থাকা উচিত নয়।'

আমাকে কেউ বারণ করেনি। কিন্তু বিজুদিদের বাড়িতে যাওয়া আমার একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। শম্ভুদার দোষে বিজুদিকে কষ্ট পেতে হল বলে মনে মনে শম্ভুদার ওপর ভারি রাগ হল।

বেশ কিছুদিন পরে শুনলাম বিজুদি পাশ করে কলেজে পড়ছে।

এদিকে শম্ভুদাও খুব বদলেছে। সন্ধ্যে হলেই বাড়ি ফিরে এসে পড়তে শুরু করে দেয়। শরীর ভালো করার জন্যে শীতের দিনেও রোজ ভোরে উঠে বেড়াতে যায়।

আমাকেও আগের চেয়ে ঢের বেশি আদর-যত্ন করে। বিজুদিকে শম্ভুদা এরই মধ্যে ভুলে গেল? এটা কিন্তু শম্ভুদার দিক থেকে উচিত হয়নি।

কিন্তু শম্ভুদা যে ভোরবেলায় বেড়াতে বেরোবার নামে বিজুদির সঙ্গে কলেজের কাছেই একটা রাস্তায় রোজ একই সময়ে দেখা করে —এটা জানতে পেরে দেশ থেকে বাবা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে খবরটা আমি তাঁকে ঠিক ঐ অর্থে ঐভাবে দিইনি। কথায় কথায় এমনি বলেছিলাম। বাবাই তার থেকে টেনে টেনে সাত কাহন করলেন।

ফলে শম্ভুদাকে কলকাতা ছাড়তে হল আর আমাকে তার আগে শম্ভুদার কাছ থেকে কান্না-পাবার-মত অনর্থক কতকগুলো কথা শুনতে হল। চোখ দিয়ে আমার টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। শম্ভুদাকে চলে যেতে হচ্ছে বলে নয়, শম্ভুদা চলে গেলে বিজুদি দুঃখ পাবে বলে।

কিছুদিন পরে ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ে বাবা বললেন, বিজুদির বাবা নাকি বাইরে কোথায় বদলি হয়ে গেছেন। তারপর থেকেই আমি ইংরেজি কাগজ পড়া শুরু করলাম।

ফলে ঠিকঠিক জানতে পারতাম বিজুদির বাবা কখন কোথায় আছেন না আছেন।

তারপর সেই শম্ভুদার একদিন বিয়েও হল। ইস্, শম্ভুদা এখন কী বিচ্ছিরি মোটা হয়েছে! টাকা করলে লোকের কী চেহারাই হয়!

পিসেমশাই নিজে দেখে মেয়ে পছন্দ করে আনলেন। শুনলাম শম্ভুদারও পছন্দ। গায়ের রং ফর্সা, ভাল গান গাইতে পারে—কিন্তু তা হলেও আমার যেন মনে হল শম্ভুদার সঙ্গে মানাচ্ছে না।

শম্ভুদা মুখে যাই বলুক, মানুষের চোখ দেখলেই ধরা যায় মিথ্যে কথা বলছে কি না। বউ যদি শম্ভুদার ঠিক মনের মতই হবে, তাহ'লে শম্ভুদা কেন আমার চোখের দিকে কিছুতেই তাকাতে পারছিল না?

শম্ভুদাকে দেখে এই প্রথম ছেলেবয়সে ঝোঁকের মাথায় একটা ভুল করে ফেলার জন্যে পায়ে ধ'রে আমার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হল।

ঘোমটা সরিয়ে যদি সেদিন কালো রঙের ওপর ভ্রমরের মত দুটো চোখের মণি দেখতে পেতাম, সত্যিই আমার আনন্দের সীমা থাকত না।

বিজুদিকে কতদিন দেখিনি!

তার দু বছর পর ট্রাম-স্টপে বিজুদির সঙ্গে দেখা।

আশ্চর্য! বিজুদিকে ট্রামে তুলে দেবার পর থেকে সারাদিন যে মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল, তার সীঁথিতে সিঁদুর নেই।

একটা ঘটনা একই সঙ্গে কতটা খারাপ এবং ভালো লাগতে

পারে, কতটা বিষাদ আর আনন্দ জাগাতে পারে—এটা প্রথম সেদিন আমি স্পষ্ট করে অনুভব করতে পারলাম।

বিজুদির সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেটা প্রথম কয়েকদিন গাঁক গাঁক করে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল। যে কাজেই হাত দিই, মন বসে না ব'লে কাজ শেষ করতে দেরি হয়ে যায়; ফলে, যাব বলে সব ঠিক-ঠাক করে রেখেও শেষ পর্যন্ত আর বিজুদির কাছে কিছুতেই যাওয়া হয়ে ওঠে না।

না গিয়ে গিয়ে যাবার ইচ্ছেটাও কমে আসে। আর সেই সঙ্গে একটা কৌতূহল-মেশানো ভয় আমাকে পেয়ে বসে—বিজুদি আমাকে কী একটা গল্প লিখে দেবার কথা বলছিল না!

গল্প যে আমি একেবারেই লিখতে পারি না, এ কথা বিজুদিকে বুঝিয়ে বলবার মত স্থান-কাল-পাত্র—কোনটাই সেদিন ছিল না। আশেপাশে একগাদা লোক, বিজুদির ট্রামে ওঠবার তাড়া, আর তা ছাড়া বললেও কি বিজুদি বিশ্বাস করত?

কারণ, বিজুদির সঙ্গে প্রথম যখন আমার আলাপ, আমি তখন ইস্কুল ম্যাগাজিনে আবোল-তাবোল গদ্য লিখতাম। আমার, এমন কি বিজুদিরও তখন ধারণা, লেখাগুলো ছিল গল্প। আমি পরে সে ধারণা বদলাবার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু বিজুদি যে পায়নি, তার কথা থেকেই তা টের পাওয়া গেল।

বিজুদি আমার চুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'চুল কাটিস না কেন রে? পদ্য লেখা হয় বলে?'

বিজুদি 'কবিতা' না ব'লে 'পদ্য' বলায় সেদিন মনটা ভারি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বিজুদিকে দেখেই আমার কবিতা শোনাবার যে বাসনাটা মনের মধ্যে মাথা উঁচু করেছিল, তাড়া-তাড়িতা দমন করে ফেলতে হল। আমার কবিতা বিজুদির

মাথায় ঢুকবে না। শুনিয়ে এবং শুনে মিছিমিছি আমরা দুজনেই কষ্ট পাব।

অথচ বিজুদিই আমাকে প্রথম কবিতা লিখতে উস্কেছিল। বলেছিল, 'দেখ্, গদ্য ছেড়ে পদ্য লেখ্। নইলে মানুষকে মাতিয়ে তোলা যাবে না'। আমিও অবশ্য তখন ছেলেমানুষ ছিলাম ব'লে 'কবিতা'কে বলতাম 'পদ্য'। বিজুদির কথায় তখন জান দিতে পারি, পদ্য লেখা কোন্ ছার। কিন্তু পদ্য লেখবার চেষ্টা করতে গিয়ে বার বার মনে হতে লাগল এর চেয়ে জান দেওয়া সহজ। সারাদিন ধরে গলদঘর্ম হয়ে চেষ্টা করি, এক লাইনও পদ্য বেরোয় না।

এদিকে বড়াই করে বিজুদিকে বলে এসেছি, 'পদ্য না লিখতে পারলে তোমার কাছে আর মুখ দেখাব না।' অথচ বিজুদির কাছে যাবার জন্যে মনটার মধ্যে ছটফট করে। পায়ের শব্দে বুঝতে পারি শম্ভুদা গটগট করে বিজুদির সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে। তার জন্যে শম্ভুদাকে পদ্য লিখতে হয় না ব'লে বিদিকে ভীষণ একচোখো ব'লে মনে হয়।

বলতে এখন লজ্জা করে, পুকুরপাড়ে ধোপাদের কাপড় আছড়ানোর শব্দ শুনতে শুনতে, হঠাৎ মনের মধ্যে গড়গড় করে খানিকটা পদ্য এসে গেল। কাগজে তা লিখে নিয়ে নাচতে নাচতে গিয়ে বিজুদিকে দেখাতেই বিজুদি আমাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরল। আমার সে কী লজ্জা, সে কী ভাল লাগা! বিজুদির কিন্তু ঠিক পদ্যেরও কান ছিল না—কেননা পরে বুঝেছিলাম আগাগোড়া সে-পদ্যের ছন্দ ভুল ছিল, শব্দগুলোর ছিরিছাঁদ ছিল না।

কিন্তু সেই যে বিজুদির পাল্লায় পড়ে পদ্য লেখা ধরলাম, তারপর থেকে সমানে লিখেই চলেছি। অবশ্য এখন আর তাকে

'পত্ত' বলি না। যাকে আমরা বলতাম 'গল্প' সেই গল্প লেখবার কথা ভাবলেও গায়ে জ্বর আসে।

ঠিক করলাম—আমি যে এখন গল্প লিখতে পারি না, এ কথাটা বিজুদিকে খোলাখুলি বলেই আসব। নিশ্চয় ভাববে, আমার চাল হয়েছে। কিন্তু আমি নাচার।

মনটাকে এইভাবে বেঁধে ফেলবার পরই দেখলাম, বিজুদির প্রতিশ্রুত গল্প সম্পর্কে আমার চাপা কৌতূহলটা হঠাৎ ফেটে পড়তে চাইছে। এতদিন দেরি করে ফেলার দরুন নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে ঠিকানাটা পকেটে ফেলে বিজুদির খোঁজে সেইদিনই বেরিয়ে পড়লাম।

বিজুদিকে পাওয়া গেল। বলল, 'এত দেরি করে এলি?' বিজুদি সেইদিন সন্ধ্যেবেলায় চলে যাচ্ছে ব'লে জিনিসপত্র গোছাতে বেজায় ব্যস্ত।

বলল, 'এটা পরের বাড়ি। না হলে তোকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দুটো কথা বলতে পারতাম। তোর সঙ্গে কতদিন পরে দেখা।'

গল্পটা অন্তত সংক্ষেপেও জেনে নেবার জন্যে ভেতরে ভেতরে তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি, বিজুদির স্থূলকায় একজন প্রৌঢ় আত্মীয় আমার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাতে তাকাতে অত্যন্ত অভদ্রের মত এমন কাছ ঘেঁষে এসে বসলেন যে আমার হাড় পিত্তি জ্বলে গেল। বুঝলাম বিজুদি এখন যে কারণেই হোক অভিভাবকদের নজরবন্দী। বিজুদির কালো চোখের মণি দুটোতে বেদনার ঢেউ খেলছে।

আস্তে আস্তে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলাম।

সম্পাদক মশাই, আপনাকে লেখা আমার এই চিঠির প্রথম

খসড়াতে আরও একটা পর্ব যোগ করা ছিল। তাতে বিজুদির সঙ্গে আরও একবার এক মফস্বল শহরে দেখা হওয়ার কথা লিখেছিলাম। দেখা হয়েছিল অল্পক্ষণের জন্যে।

আমার কয়েকজন বন্ধুর উপদেশে শেষ পর্যন্ত সে অংশটা বাদ দিতে হল। তাঁদের মতে ওটা শুধু যে নেহাৎ মামুলি হয়েছে তাই নয়, ওটুকু পড়ে আমার সম্পর্কে তো বটেই বিজুদির সম্পর্কেও লোকের ধারণা খারাপ হবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের সমালোচনা সত্ত্বেও হাজার চেষ্টা করেও পৃথিবীর অতিব্যবহৃত এবং সবচেয়ে মামুলি ঘটনাটি বিজুদির জীবন থেকে কিছুতেই বাদ দেওয়া গেল না। আমি চলে আসবার এক বছরের মধ্যে খবর পেলাম বিজুদি মুখে রক্ত তুলে মারা গেছে।

বিজুদিই আমাকে দিয়ে প্রথম পত্র লিখিয়েছিল। পরে এক সময়ে আমাকে দিয়ে গল্প লেখাবার কথাও ভেবেছিল। গোড়ায় আমার নিজের দোষে এবং শেষে বিজুদির দোষে গল্পটা আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে।

ফলে, আমি আপনাদের গল্প দিই কী ক'রে?